প্রণয়নে ঃ-
আব্দুল হামীদ মাদানী

www.abdulhamid-alfaidi-almadani.webs.com

https://archive.org/details/@salim_molla

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

ইসলাম একটি সরল-সহজ ও মধ্যমপন্থী ধর্ম। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের মত এ ধর্মের মানুষরাও সীমালংঘনের শিকার। কেউ তা অমান্য ও অবজ্ঞা ক'রে ধর্ম-সীমার বাইরে থাকে। আবার কেউ তাতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ক'রে তার সীমা অতিক্রম করে।

গোঁড়ামিতে কেউ নিজের প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়। কেউ তার বাপ-দাদা অথবা নিজেদের ভক্তিভাজন আলেম-উলামাদেরকে প্রাধান্য দেয়। দাদুপন্থীরা জং পড়া ধর্মকর্মে কোন 'তাজদীদ' ও 'তাহক্বীক্ব' মানতে চায় না।

কেউ মানতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে। জায়েয-সুন্নত-ফরয সর্বপ্রকার আমলকে একাকার জ্ঞান ক'রে পালন করে।

কেউ মানতে ও মানাতে গিয়ে সহিংসতার শিকার হয়। জোশ ও আবেগে পড়ে অকারণে 'গাযী' ও 'শহীদ' হতে চায়। বদনাম হয় ইসলামের, বদনাম হয় মুসলিমদের।

মুসলিমদের উক্ত অবস্থা দর্শনে বহু আরবী লেখক বহু পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন। আমিও সেই সব অধ্যয়ন ক'রে এই পুস্তিকা বাঙালী ভাইদের জন্য লিখে ফেললাম। 'এ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায়, খলসে বলে আমিও যাই' প্রবাদ অনুযায়ী লেখক সাজার শখ আমার নয়। বরং একজন আলেম হিসাবে দ্বীনী আমানত রক্ষা করতে হক জেনে হক পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়, তারই সানুরাগ তৎপরতা এটি।

মহান আল্লাহ যেন তা এই দীন-হীন বান্দার নিকট থেকে কবুল ক'রে নেন, আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৬/ ১১/২০০৯খ্রিঃ

ইসলাম একটি সরল ও মধ্যপন্থী ধর্ম

মহান সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম হল মধ্যপন্থী ধর্ম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

আর মধ্যমপন্থা হল চরমপন্থা ও নরমপন্থার মাঝামাঝি পন্থা। সুতরাং মুসলিম হবে মধ্যমপন্থী। না কড়াপন্থী হবে, আর না ঢিলেপন্থী।

মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (٩٠) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

ইমাম শওকানী বলেছেন, মহান আল্লাহ এখানে ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর বান্দারা যেন দ্বীনের ব্যাপারে মধ্যপন্থী হয়; তারা যেন চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে গিয়ে ইসলামে নিন্দিত অতিরঞ্জনে পতিত না হয় এবং নরমপন্থার দিকে ঝুঁকে গিয়ে যেন কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন না করে। *(ফাতহুল ক্বাদীর ৩/ ১৮৮)*

আমাদের দ্বীন সরল-সহজ। দ্বীনে কঠোরতা ও কঠিনতা নেই। মুসলিম হবে উদার দ্বীনদার; অনুদার গোঁড়া হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শরীয়তের সকল হুকুম-আহকামকে ঠিক সেইরূপ সরলভাবে পালন করবে, যেরূপ পালন করতে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে সে কঠিনতা আনবে না, নিজের উপর অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে নেবে না, হালালকে হারাম করবে না; যেমন দ্বীনকে খুব সহজ ভেবে হারামকে হালালও ক'রে নেবে না।

বৈধ (জায়েয) ও বিধেয় (মাশরু')র মাঝে পার্থক্য বুঝবে। উচিত ও জরুরীর মাঝে তালগোল পাকাবে না। 'করতে হয়'-কে 'করতেই হবে'র মান দান করবে না। যেমন ওয়াজেব, মুস্তাহাব ও মুবাহ-এর মাঝে তালগোল পাকাবে না এবং হারাম, মকরূহ ও মুবাহ-এর মাঝেও যথার্থ পার্থক্য বজায় রাখবে।

যে ইবাদত একাধিক নিয়মে করা যায়, তা এক নিয়মেই সীমাবদ্ধ ভেবে বিরোধীর সাথে গোঁড়ামি প্রদর্শন করবে না।

যে বিষয়ে সহীহ দলীলভিত্তিক ইজতিহাদী মতভেদ আছে, সে বিষয়েও কোন একটা বিষয়ের উপর অপরিহার্য গুরুত্ব সৃষ্টি করবে না।

এ দ্বীন পালনে কারো কষ্ট ও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বান্দাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মহান প্রতিপালক এ দ্বীন দান করেননি। তিনি বলেন,

{طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى} [طه : ١]

অর্থাৎ, ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। *(সূরা ত্বাহা ১-২ আয়াত)*

এ দ্বীনে আছে উদারতা ও প্রশস্ততা। এতে কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই। আকীদা, ইবাদত ও আখলাকে এ দ্বীনকে মানুষের প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস করা হয়েছে। কারো উপর তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা চাপানো হয়নি। কেউ তার সাধ্যের বাইরের কোন কাজ করুক, তা চাওয়া হয়নি। সামর্থ্যে কুলায় না এমন কাজ কাউকে করতে বলা হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না। *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। *(সূরা হাজ্জ ৭৮ আয়াত)*

{يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} (٢٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। *(সূরা নিসা ২৮ আয়াত)*

{يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : ١٨٥]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত নবী ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ

পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।” *(বুখারী ৩৯নং)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।”

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

যাঁরা মহানবী ﷺ-এর জীবনী সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, তাঁরা অবশ্যই সাহাবাবর্গের সাথে তাঁর সরল আচরণ জানেন। সে আচরণে কোন প্রকার কঠিনতা নেই।

আর আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংসগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।’ তিনি বললেন, “কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংসগ্রস্ত ক’রে ফেলল?” লোকটি বলল, ‘আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ক’রে ফেলেছি।’ এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, “তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে পারবে?” লোকটি বলল, ‘জী না।’ তিনি বললেন, “তাহলে কি তুমি একটানা দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?” সে বলল, ‘জী না।’ তিনি বললেন, “তাহলে কি তুমি ষাট জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে পারবে?” লোকটি বলল, ‘জী না।’ কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ এক ঝুড়ি খেজুর এনে বললেন, “এগুলি নিয়ে দান ক’রে দাও।” লোকটি বলল, ‘আমার চেয়ে বেশী গরীব মানুষকে হে আল্লাহর রসূল? আল্লাহর কসম! (মদীনার) দুই হার্রার মাঝে আমার পরিবার থেকে বেশী গরীব অন্য কোন পরিবার নেই!’ এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে ফেললেন এবং তাতে তাঁর ছেদক দাঁত দেখা গেল। অতঃপর বললেন, “তোমার পরিবারকেই তা খেতে দাও!” *(বুখারী ১৯৩৭, মুসলিম ১১১১নং)*

১। শরীয়তের বিধান সহজ বলেই এতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যাকে ‘রুখসাহ’ (অনুমতি, অব্যাহতি, ছাড়) বলা হয়। এতে কঠিনকে সহজ করা হয়; যেমন মাগগিকে

সস্তা করা হয়। আর সস্তা জিনিসকে 'রাখীস' বলা হয়।

এটি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আকীদা, ইবাদত, ব্যবহার ও দন্ডবিধিতে এ বিধানের বড় প্রভাব রয়েছে। এ হল মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সাদকা। যেমন সফরে নামায কসরের বিধান।

একদা য়্যা'লা বিন উমাইয়া ﷺ উমার ﷺ-কে বলেন, কি ব্যাপার যে, লোকেরা এখনো পর্যন্ত নামায কসর পড়েই যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তো কেবল বলেছেন যে, "যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।" *(সূরা নিসা ১০১ আয়াত)* আর বর্তমানে তো ভীতির সে অবস্থা অবশিষ্ট নেই?

উমার ﷺ উত্তরে বললেন, যে ব্যাপারে তুমি আশ্চর্যবোধ করছ, আমিও সেই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে নবী ﷺ-এর নিকট এ কথার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এটা তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর একটি সদকাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর সদকাহ গ্রহণ কর।" *(আহমাদ, মুসলিম ১৫৭৩নং, মিশকাত ১৩৩৫নং)*

এ লাঘব বান্দার জন্য মহান আল্লাহর মহাদান। তিনি কারো উপর সাধ্যাতীত ভারার্পণ করেন না। পরন্তু মূলতঃ কষ্টের কারণে লাঘব এলেও কষ্টের অবস্থা দূর হওয়ার পরেও সে নীতি তিনি বহাল রাখেন। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তাঁর অবাধ্যতা করা হোক।" *(আহমাদ ৫৮৭৩নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর ফরয পালন করা হোক।" *(বায্যার প্রমুখ)*

উদাহরণ স্বরূপ কিছু অনুমতিপ্রাপ্ত আমল নিম্নরূপঃ-

(ক) সফর অবস্থায় ভার লাঘব ঃ যেমন, চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামাযকে দুই রাকআত ক'রে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যোহর-আসর ও মাগরিব-এশার নামায আগা-পিছা ক'রে এক সাথে জমা ক'রে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ফরয রোযা সফরে না রেখে পরে কাযা ক'রে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ} (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সফরে রোযা রাখা ভাল নয়।" *(বুখারী ১৯৪৬, মুসলিম ২৬১২নং)*

(খ) তায়াম্মুম ঃ পানি না পাওয়া গেলে অথবা তার ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ওযূ-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল।

অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো জিজ্ঞাসাই।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩২৫, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৫৩১নং)*

আমর বিন আস ﷺ বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ-সফরে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম ক'রে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

এ কথা শুনে তিনি হাসলেন এবং অন্য কিছুই বললেন না। *(বুখারী, সহীহ আবূ দাউদ ৩২৩নং, আহমাদ প্রমুখ)*

(গ) মহিলাদের মাসিক ও নিফাস অবস্থায় ভার লাঘবের বিধান ঃ এই অবস্থায় মহিলাদের নামায মাফ, রোযা কাযা করতে হবে।

২। শরীয়তের বিধান সহজ বলেই নিম্নের এই নীতি সাব্যস্ত হয়েছে ঃ-

মূলতঃ ইবাদত নিষিদ্ধ; যতক্ষণ না তা বিধেয় হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, বিনা দলীলের ইবাদত বিদআত।

মূলতঃ সর্বপ্রকার পানাহার ও পোশাকাদি ব্যবহার বৈধ; যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং যা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যাবে, তাই হারাম এবং অবশিষ্ট হালাল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে বহু নিদর্শন। *(সূরা জাসিয়াহ ১৩ আয়াত)*

বাড়াবাড়ি ক'রে কেউ নিজের তরফ থেকে হারাম-হালালের বিধান বানিয়ে নেবে অথবা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তার পথও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন মহান প্রতিপালক। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। *(সূরা মাইদাহ ৮৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ-কে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কোন জিনিসকে হারাম করারও অনুমতি ছিল না। তিনি বলেছেন, "মহান আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন করো না, অনেক জিনিসকে হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে তার (মর্যাদার পর্দা) ছিন্ন করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া ক'রে---ভুলে গিয়ে নয়---বহু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা অনুসন্ধান করো না।" *(হাসান হাদীস, দারাকুত্বনী প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেছেন, "মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হল সেই ব্যক্তি, যার জিজ্ঞাসার কারণে সেই জিনিস হারাম করা হল, যা পূর্বে হারাম ছিল না।" *(আবূ দাঊদ)*

এই জন্য মহান আল্লাহ বিশেষ ক'রে বিধান অবতীর্ণ কালে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (١٠١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমাদেরকে খারাপ লাগবে। কুরআন অবতরণের সময় তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ (পূর্বেকার) সে সব বিষয় ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় সহনশীল। *(সূরা মাইদাহ ১০১ আয়াত)*

পূর্ববর্তী জাতির অনেকে এই শ্রেণীর অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন ক'রে নিজেদেরকে সমস্যায় ফেলেছিল। সে কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ} (١٠٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা তা অস্বীকার ক'রে (কাফের হয়ে যায়)। *(ঐ ১০২ আয়াত)*

উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন উক্ত প্রকার অপরাধে লিপ্ত হয়ো না। যেমন, একদা রসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন।" একজন সাহাবী

জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রত্যেক বছরেই কি?' তিনি নীরব থাকলেন। জিজ্ঞাসক পর পর তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর নবী করীম ﷺ তার উত্তরে বললেন, "আমি যদি হ্যাঁ বলি, তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফরয হয়ে যাবে। আর যদি এমনটি হয়েই যায়, তাহলে প্রতি বছর হজ্জ পালন করতে তোমরা অক্ষম হবে।" *(মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায় ৪১২নং, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

এ জন্যেই কোন কোন ভাষ্যকার (عَفَا اللهُ عَنهَا) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ যে জিনিসের উল্লেখ তাঁর কিতাবে করেননি, সেটা ঐ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এ ব্যাপারে (জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে) নীরব থাক; যেমন তিনি তা উল্লেখ করা থেকে নীরব রয়েছেন। *(ইবনে কাসীর)*

এক হাদীসে নবী ﷺ এই অর্থকেই এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, "তোমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তোমরা আমাকেও ছেড়ে দাও। (যা তোমাদেরকে কিছু বলা হয়নি, তার ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না।) কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ধ্বংসের মূল কারণ ছিল, বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া।" *(মুসলিম)*

যেমন সূরা বাক্বারায় গাভী যবেহ করার ঘটনায় বানী ইস্রাঈল মূসা ﷺ-কে অনর্থক প্রশ্ন করেছিল এবং নিজেদেরকে খামাখা সমস্যায় ফেলেছিল।

"যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহর আদেশ দিয়েছেন', তখন তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' মূসা বলল, 'আমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হওয়া হতে আল্লাহর শরণ নিচ্ছি।'

তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, ঐ গাভীটি কিরূপ?' মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, এ এমন একটি গাভী যা বৃদ্ধা নয়, অল্প বয়স্কও নয়, মধ্য বয়সী। অতএব তোমরা যা আদেশ পেয়েছে তা পালন কর।'

তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিতে বল, তার (গাভীটির) রং কি?' মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গাভী, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়; যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, গরুটি কি ধরনের? আমাদের নিকট গরু তো পরস্পর সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথ পাব।'

মূসা বলল, 'তিনি বলছেন, এ এমন একটি গাভী যা জমির চাষে ও ক্ষেতে পানি

সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি -- সুস্থ নিখুঁত।' তারা বলল, 'এখন তুমি সঠিক বর্ণনা এনেছ।' অতঃপর তারা তা যবেহ করল, অথচ যবেহ করতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না।" *(সূরা বাক্বারাহ ৬৭-৭১ আয়াত)*

তাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একটি গাভী যবেহ করবে। তারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করলেই আল্লাহর আদেশ পালন হয়ে যেত। কিন্তু তারা আল্লাহর নির্দেশের উপর সোজাসুজি আমল করার পরিবর্তে খুঁটিনাটির পিছনে পড়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করতে শুরু ক'রে দিল। ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদের সে কাজকে পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য কঠিন ক'রে দিলেন। বলা বাহুল্য, এই জন্যই দ্বীনের (খুঁটিনাটির) ব্যাপারে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাতে ও কঠিনতা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে। *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

৩। দ্বীনের বিধান সহজ এবং মানব-প্রকৃতির অনুকূল বলেই মানুষের ভুল ক্ষমার্হ; ভুলে গিয়ে অথবা ভুল ক'রে কোন অপরাধ ক'রে ফেললে, তা ধর্তব্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ সাধ্যের অতীত কাউকে দায়িত্ব দেন না এবং ভুল ধর্তব্য নয় বলেই তিনি আমাদেরকে অনুরূপ দুআ করতে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন,

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব

অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৬ আয়াত)*

উক্ত দুআ করলে মহান আল্লাহ মঞ্জুর ক'রে বলেন, 'আমি তাই করলাম।' *(মুসলিম ৩৩০নং)*

ভুল ক'রে ক্বিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ ক'রে নামায পড়লে, নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। ভুল ক'রে হকদার নয় এমন লোককে যাকাত দিলে, তা কবুল হয়ে যায়। ভুল ক'রে রোযার দিনে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয় না। ইত্যাদি। অবশ্য ভুল ক'রে প্রাণ হত্যা করার কথা একটু পৃথক।

মহান প্রতিপালক বান্দার প্রতি বড় মেহেরবান। তিনি মানুষকে এমন প্রকৃতি দান করেছেন, যাতে ভুল-বিস্মৃতি স্বাভাবিক। তাই তাঁর বিধানে রয়েছে এমন সহজতা।

৪। দ্বীনের বিধান কঠিন নয় বলেই মহান আল্লাহ মানুষের সেই অপরাধ ধরেন না, যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়, যা সে অগত্যায় নিরুপায় হয়ে করে।

এই জন্য হারাম জিনিস অবৈধ ঘোষণার পর তিনি বলেছেন,

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৩ আয়াত)*

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

যাদেরকে চাপ দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়, তারা কাফের গণ্য হবে না। জোর ক'রে কবুল করানো বিবাহ শুদ্ধ নয়, জোর ক'রে নেওয়া-দেওয়া তালাক শুদ্ধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٠٦) سورة النحل

অর্থাৎ, কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। *(সূরা নাহল ১০৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার জন্য আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং বাধ্য হয়ে কৃত পাপকে মার্জনা ক'রে দিয়েছেন।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৭৩১নং)*

৫। বিভ্রান্তিতে পড়ে পাপ হতে পারে। আর তার জন্য মহান আল্লাহর একটি বিধান হল পাপ-খন্ডন। তার জন্য কাফ্‌ফারার বিধান দিয়েছেন। তাতে রয়েছে সহজ থেকে সহজতর এখতিয়ার। আর দিয়েছেন তওবার বিধান।

ইসলামের বিধান অতি সরল। আক্বীদার বিধানে কোন জটিলতা নেই, কোন প্রচ্ছন্নতা নেই, কোন কুসংস্কার নেই।

ইবাদতেও তাই। তাতে কোন কষ্ট নেই, মানুষ করতে পারবে না এমন কোন ইবাদতের চাপ নেই। নফল ইবাদত করার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী ৪৩, মুসলিম ১৮৩৪নং)*

ইসলামের পবিত্রতার বিধানেও রয়েছে সহজতা। ইবাদতের প্রবেশ-পথ হল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। আর তার জন্য গোসল-ওযূর প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে পানি না পাওয়া গেলে এবং ঠান্ডার সময় কষ্ট লাঘব করার জন্য তায়াম্মুমের বিধান দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী শরীয়তে কেবল পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন সম্ভব ছিল।

সকল প্রকার পানিকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে; যদি তার রং, গন্ধ ও স্বাদ অপরিবর্তিত থাকে।

সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র বলা হয়েছে।

দুগ্ধপোষ্য ছেলে সন্তান কাপড়ে পেশাব ক'রে দিলে, তার ওপর পানির ছিটা দিয়ে নামায শুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গোসল করার সময় মহিলাদের মাথার বেণি খোলা জরুরী নয়।

অপবিত্র মাটিতে চলার পর পবিত্র মাটিতে চললে তাদের লেবাসের নিম্নাংশ পবিত্র হয়ে যায়।

ইসলামের কিছু সহজতার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "---আর সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ (নামাযের জায়গা) এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট যে কোন স্থানে নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়।" *(বুখারী ৪৩৮নং, মুসলিম)*

নামাযের বিধানও বড় সরল। প্রতিদিন মাত্র পাঁচবার এই নামায পড়তে হয় এবং তাতে সময় বেশী লাগে না। পঞ্চাশ ওয়াক্তের জায়গায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মুসলিম পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সওয়াব লাভ করে।

মুসাফির অবস্থায় জমা ও কসর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভয়ের অবস্থায় নামায আরো হাল্কা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِـنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (١٠١) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয় অবিশ্বাসিগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা নিসা ১০১ আয়াত)*

নামাযের সময় হলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় নামায আদায় হয়ে যাবে। মসজিদ ছাড়া নামায হবে না---এমন কথা নয়। অবশ্য অপবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থানের কথা আলাদা। কিন্তু পূর্ববর্তী জাতির জন্য উপাসনা কেবল উপাসনালয়েই শুদ্ধ ছিল; মুসলিম জাতির জন্য তা নয়।

জামাআতের নামায হাল্কা ক'রে পড়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। একদা মহানবী ﷺ মুআয ﷛-কে এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "তুমি কি লোকেদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি যখন ইমামতি করবে, তখন 'অশ্‌শামসি অযুহা-হা, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা, অল্লাইলি ইযা য়্যাগশা' পাঠ কর। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদ্‌গ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে।" *(বুখারী ৭০৫, মুসলিম ১০৪০, নাসাঈ, মিশকাত ৮৩৩ নং)*

তিনি আরো বলতেন, "আমি নামাযে মনোনিবেশ ক'রে ইচ্ছা করি যে, নামায লম্বা

করব। কিন্তু শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করে নিই। কারণ, জানি যে, শিশু কাঁদলে (নামাযে মশগুল) তার মায়ের মন কঠিনভাবে ব্যথিত হবে।" *(বুখারী ৭০৭, মুসলিম ১০৫৬, মিশকাত ১১৩০ নং)*

ঋতুমতী মহিলা এবং প্রসবোত্তর খুনে অপবিত্র মহিলার জন্য নামায মাফ করা হয়েছে। এই সময়কার নামাযগুলি কাযা করা মহিলার পক্ষে বড় ভারি ছিল। তাই করুণাময় মহান প্রতিপালক মাফ ক'রে দিয়েছেন।

নামাযে ভুল হলে ফিরে পড়তে হয় না, সহু সিজদার মাধ্যমে তা সংশোধন করা যায়।

রোগীর নামাযকে হাল্কা করা হয়েছে। মহানবী ﷺ (রোগীকে) বলেছেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(আহমাদ, বুখারী, আবু দাঊদ, মিশকাত ১২৪৮ নং)* "যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে মাটিতে নামায পড় (সিজদাহ কর)। তা না পারলে কেবল ইশারা কর। আর তোমার রুকূর তুলনায় সিজদাকে অধিক নিচু কর।" *(ত্বাবারানী, বাযযার, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩২৩নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফর করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই সওয়াবই লিখে থাকেন, যে সওয়াব সে সুস্থ ও ঘরে থাকা অবস্থায় আমল করে লাভ করত।" *(আহমাদ, বুখারী, সহীহুল জামে' ৭৯৯নং)*

এ ছাড়াও অন্যান্য ভার লাঘব করার বিধান রয়েছে ইসলামের এই দ্বিতীয় রুকনে। যাতে বুঝা যায় যে, দ্বীন কঠিন নয় এবং দ্বীনকে কঠিন ক'রে নেওয়ারও কোন যুক্তি নেই।

ইসলামের তৃতীয় রুক্‌ন যাকাতেও সেই সুবিধার বিধান পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহর হক আল্লাহর ইচ্ছামত চাইতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে তিনি নির্দিষ্ট জিনিসে, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট পরিমাণে চেয়েছেন।

সুতরাং জমি, গাড়ি ও বাড়ি (ব্যবসার জন্য না হলে তা)তে যাকাত ফরয নয়।

সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা তার মূল্য পরিমাণ টাকা, অনুরূপ সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা না হলে যাকাত ফরয নয়। নির্দিষ্ট ফসল ও পশু নির্দিষ্ট পরিমাণ ও সংখ্যা ছাড়া যাকাত ফরয নয়।

নিসাব পরিমাণ মাল এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই খরচ হয়ে গেলে অথবা নিসাব পরিমাণ থেকে কম হয়ে গেলে তাতে যাকাত ফরয নয়। অর্থাৎ, এই যাকাত সারা বছরে কেবল একবার আদায় করতে হবে। আর তাও মাত্র আড়াই শতাংশ। মহান আল্লাহ দিয়েছেন কত বেশী, আর চেয়েছেন কত অল্প!

রোযার ব্যাপারেও রয়েছে কষ্ট লাঘবের সুন্দর বিধান।

রোযা কেবল সারা বছরে একমাস ফরয।

রোযার রাতে খাওয়া জরুরী। যথাসময়ে ইফতারী না ক'রে দেরী করা যায় না। একটানা না খেয়ে দুই বা তার বেশী দিন (বিসাল) রোযা রাখা যায় না।

রোযা রেখে ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোযার ক্ষতি হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "যে রোযাদার ভুলে গিয়ে পানাহার ক'রে ফেলে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ ক'রে নেয়। এ পানাহার তাকে আল্লাহই করিয়েছেন।" *(আহমাদ ২/৩৯৫, ৪২৫, ৪৯১, ৫১৩, বুখারী ১৯৩৩, মুসলিম ১১৫৫, আবূ দাউদ ২৩৯৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৬৭৩, বাইহাক্বী ৪/২২৯)*

কেউ সফরে গেলে অথবা রোগগ্রস্ত হলে সে রোযা কাযা করতে পারে। কারো কাযা করার সামর্থ্য না হলে মিসকীন খাওয়াতে পারে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٤) البقرة

অর্থাৎ, (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত)*

হজ্জের বিধানে রয়েছে সরলতার বিধান।

আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য না থাকলে হজ্জ ফরয নয়।

মহিলার স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ সাথী না থাকলে হজ্জ ফরয নয়।

সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয।

তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে যে কোন এক প্রকার করলে যথেষ্ট হয়।

ঈদের দিন করণীয় আমলগুলি সুবিধামত আগাপিছা করা যায়।

সামর্থ্য না থাকলে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ-সাঈ করা যায়।

হজ্জের কোন ওয়াজেব ত্যক্ত হলে তার পরিবর্তে কুরবানী দিলে যথেষ্ট হয়।

ইসলামের ব্যবহারিক জীবনেও রয়েছে নানা কষ্ট লাঘবের বিধান। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম, চাষাবাদ, শিক্ষা ইত্যাদি দৈনন্দিন পরস্পর আদান-প্রদান ও ব্যবহারের

মধ্যেও কোন অসুবিধা রাখা হয়নি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়কালে অতি সরল মানুষ।" *(বুখারী ২০৭৬ নং)*

ক্রেতা-বিক্রেতার স্বস্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার আছে।

মানুষের মাঝে সহমর্মিতা বজায় রাখার মানসে সূদ হারাম করা হয়েছে এবং বিনা সূদে ঋণ দিতে ও দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

খাদ্য গুদামজাত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রত্যেক ধোঁকামূলক ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।

ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধে অতিরিক্ত সময় দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ঋণ মাফ ক'রে দেওয়ার বড় প্রতিদান ঘোষণা করা হয়েছে।

দণ্ডবিধিতেও রয়েছে ইসলামের মহান উদারতা।

মানুষ খুন হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে একটি মানুষ খুন করা মানে পৃথিবীর সকল মানুষকে খুন করা।

'খুনের বদলে খুন' আইন প্রচলিত করা হয়েছে। আর তাতে রয়েছে মানুষের জীবন এবং মানবাধিকার রক্ষা।

খুনের বিনিময়ে রক্তপণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং মাফ ক'রে দেওয়ার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য কিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা

সাবধান হতে পার। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৮- ১৭৯ আয়াত)*

খুনের বদলে খুন কার্যকর করার জন্য হত ব্যক্তির সকল ওয়ারেসকে সম্মত হতে হবে। কেউ নাবালক থাকলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে অথবা অসম্মত থাকলে (অর্থাৎ, মাফ ক'রে দিলে) উক্ত আইন কার্যকর হবে না।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি---বিশেষ ক'রে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি---খুব বড়; বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা এবং অবিবাহিতকে একশ' চাবুক। অথচ এমন অপরাধ সহজে ঘটে থাকে। তাছাড়া এ অপরাধের মাধ্যমে অপবাদ লাগে, সংসার ভাঙ্গে এবং কূল নষ্ট হয়। তাই এ অপরাধের শাস্তি বড় এবং তা কার্যকর করার শর্তাবলীও বড় কঠিন।

অপরাধ প্রমাণ করার জন্য কর্মরত অবস্থায় দেখেছে এমন চারটি লোকের সাক্ষ্য চাই। নচেৎ শাস্তি কার্যকর হবে না।

ব্যভিচার ঘটে গেলে যথাসম্ভব তার শাস্তি কার্যকর না করার বাহানা খোঁজা এবং তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে।

একদা মায়েয নামক এক সাহাবী বললেন, 'আল্লাহর রসূল! আমি পাপ করেছি। আমাকে পবিত্র ক'রে দিন।'

আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, "ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।"

কিন্তু মায়েযের বিবেক মানল না; কিছু পরে অথবা পরের দিন আবার এসে বলল, 'আল্লাহর রসূল! আমি পাপ করেছি। আমাকে পবিত্র ক'রে দিন।'

মহানবী ﷺ বললেন, "ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।"

অনুরূপ তিনবার ফিরিয়ে দেওয়ার পরেও চতুর্থবারে এসে মায়েয আবার একই কথা বললেন।

মহানবী ﷺ এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে কোন অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ক'রে দেব?"

মায়েয বললেন, 'ব্যভিচার থেকে। আমি ব্যভিচার ক'রে ফেলেছি।'

মহানবী ﷺ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ও পাগল তো নয়?"

সাহাবাগণ বললেন, 'না। ও পাগল নয়।'

মহানবী ﷺ বললেন, "ও মদ খায়নি তো?"

সাহাবাগণ তাঁর মুখ শুঁকে দেখলেন, মদের কোন গন্ধ নেই।

মহানবী ﷺ বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি কোন মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখেছ। অথবা তাকে স্পর্শ করেছ। অথবা তাকে চুম্বন দিয়েছ।"

মায়েয বললেন, 'না। আমি ব্যভিচার করেছি।'

মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ?"

মায়েয বললেন, 'জী হ্যাঁ। আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলুন!'

মহানবী ﷺ বললেন, "সুর্মাকাঠি যেমন সুর্মাদানে প্রবেশ করে অথবা রশি যেমন কুঁয়োতে প্রবেশ করে সেইরূপ তুমি সঙ্গম করেছ? তুমি কি জান, ব্যভিচার কাকে বলে?"

মায়েয বলল, 'জী হ্যাঁ। স্বামী নিজ স্ত্রীর সঙ্গে যা করে, আমি তাই ক'রে ফেলেছি।'

আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে কোন প্রকারে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি বিবেকের দংশনে পাপের শাস্তি ভোগার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরিশেষে গর্ত খুঁড়ে (কোমর পর্যন্ত গেড়ে) পাথর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলা হল।

এরপর গামেদ গোত্রের এক মহিলা এসে অনুরূপ তওবা করতে চাইল; বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র ক'রে দিন।'

মহানবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।"

মহিলাটি বলল, 'আপনি কি মায়েযের মত আমাকেও ফিরিয়ে দিতে চান? আল্লাহর কসম! ব্যভিচারের ফলে আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি।'

মহানবী ﷺ বললেন,"ঠিক আছে। (তোমার পেটের নিরপরাধ সন্তানকে তো আর মারতে পারি না।) সন্তান প্রসব করার পর তুমি এস।"

যথাসময়ে সন্তান প্রসব করার পর একটি বস্ত্রখন্ডে বাচ্চাকে জড়িয়ে এনে মহিলা বলল, 'আল্লাহর রসূল! এই যে আমি সন্তান প্রসব করে ফেলেছি। এখন আমাকে পাক ক'রে দিন!'

মহানবী ﷺ বললেন, "কিন্তু তোমার বাচ্চাটাকে দুধ পান করাবে কে? যাও, দুধ ছেড়ে অন্য খাবার খেতে শিখলে তুমি এস, তোমাকে পাক ক'রে দেব।"

একদিন ছেলেটি রুটি খেতে পেরেছে। রুটির একটি টুকরা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মহানবীর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে মহিলা বলল, 'আল্লাহর রসূল! এই যে, আমার বাচ্চা দুধ ছেড়ে রুটি খেতে শিখে নিয়েছে। এখন আমাকে পবিত্র ক'রে দিন!'

সুতরাং ছেলেটিকে এক আনসারীর দায়িত্বে দিয়ে মহানবী ﷺ তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। ফলে তাকে মেরে ফেলা হল। *(বুখারী ৭১৬৭, মুসলিম ৪৪২০নং)*

ইসলাম সরল-সহজ ধর্ম বলে তার ব্যবহার শাস্ত্রে ফুকাহা কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিভিন্ন সরল নীতি নির্ধারিত হয়েছে। তার একটি হল,

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِير.

অর্থাৎ, কষ্ট সহজতাকে টেনে আনে।

অর্থাৎ, যদি কোন আমল করতে সত্যই খুব কষ্ট হয়, তাহলে তা না করতে পারলে, যা সহজ তা করা যাবে অথবা আল্লাহ মাফ ক'রে দেবেন। যেমন রমযানে রোযা রাখতে কষ্ট হলে কাযা করা যাবে, তাতেও কষ্ট হলে মিসকীন খাওয়ালে যথেষ্ট হবে। হজ্জের সময় কুরবানীর দিন করণীয় কাজগুলি সুবিধা মত আগা-পিছা করা যাবে। মহান করুণাময় আল্লাহ বান্দার কষ্ট চান না, কারো সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাতে চান না।

আর দ্বিতীয়টি হল,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات.

অর্থাৎ, প্রয়োজন অবৈধকে বৈধ করে।

অর্থাৎ, অবৈধ করতে যদি মানুষ বাধ্য বা নিরুপায় হয়, তাহলে তা বৈধ হয়ে যায়। যেমন শুয়োর অবৈধ; কিন্তু শুয়োর ছাড়া যদি কোন খাবার না থাকে, তাহলে জান বাঁচানোর জন্য তা পরিমাণ মত খাওয়া বৈধ। সূদ দেওয়া অবৈধ; কিন্তু সূদ ছাড়া যদি ঋণ না পাওয়া যায় এবং ঋণ করতেই হয়, তাহলে সূদী ঋণ নেওয়া বৈধ। পণ দেওয়া অবৈধ; কিন্তু পণ ছাড়া যদি পাত্র না পাওয়া যায় এবং মেয়ের বয়স বেড়েই যায়, তাহলে পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া বৈধ। ইত্যাদি।

সরলতা উপেক্ষা করার প্রভাব

ইসলামের প্রশস্ততা ও সরলতার বিধান যে উপেক্ষা করবে, সে নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা ও কঠিনতার শিকার হবে। সে ব্যক্তি নিজে কষ্ট ভোগ করবে এবং অপরকেও ভোগাবে, নিজে মরবে এবং অপরকেও মারবে। অথচ সে কষ্ট ও সে মরণ আল্লাহ চান না।

সরলতা থেকে দূরে সরে এলে মুসলিমের জীবনে কোন্ শ্রেণীর প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ-

(ক) সরলতার বিধান উপেক্ষা করলে সাধ্যের বাইরে বোঝা বহন করতে গিয়ে মানুষ খামাখা কষ্ট পাবে। কখনো বা অবাধ্যতার শিকার হবে। যেমন নিম্নের হাদীস থেকে বুঝা যায় ঃ-

আনাস ﷺ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এল। তারা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর যখন তাদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তারা যেন তা অল্প মনে করল এবং বলল, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পেয়ে তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪০৩নং)*

মানব-প্রকৃতিকে উল্লংঘন ক'রে যদি যথাসময়ে ঘুম বর্জন করা হয়, যথাসময়ে প্রয়োজন মত পানাহার বর্জন করা হয় এবং প্রাকৃতিক যৌনক্ষুধাকে দমন করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এক সময় অবশ্যই এমন আসবে, যখন মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়বে। অবসাদগ্রস্ত হয়ে স্বাস্থ্য ও মন ভেঙ্গে যাবে। শিশিরের চ্যাঙ্গ যেমন পানি থেকে উঠে ঘাসে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে আনন্দ পায়, অতঃপর রোদ উঠলে শিশির শুকিয়ে গেলে অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় আর পানিতে ফিরে আসতে পারে না, তেমনি উক্ত শ্রেণীর মানুষদের অবস্থা হয়।

এমন ইবাদত ও দাওয়াতের পথ অবলম্বন করলে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত

বাতিল হয়, অনেক মানুষের অধিকার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে; যে অধিকার পালন করাও ইবাদত।

অনুরূপ সহজ পথ বর্জন ক'রে মানুষ অনেক সময় বিপদ আনয়ন করে। যেমন,

জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩২৫, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৫৩১নং)*

বলা বাহুল্য, সরলতার বিধান থেকে দূরে সরে গেলে কোন না কোন বিপদ অনিবার্য; যা মহান আল্লাহ চান না।

(খ) সরলতার বিধান দৃষ্টিচ্যুত করলে দ্বীনকে ভুল বুঝার ত্রুটি সৃষ্টি হয়। আর সেই ভুলকে ভিত্তি ক'রে অনেকে আমল করে, দাওয়াত দেয় এবং ফতোয়া দেয়। অথচ মহান আল্লাহ দ্বীনকে মানুষের জন্য কঠিন বানাননি। এই শ্রেণীর লোকেরা তখন কেবল শাস্তি ও ধমকের বাণী শোনায়। আর ক্ষমা ও করুণার বাণী এড়িয়ে চলে; যেমন এক শ্রেণীর ঢিলেপন্থী এর বিপরীত করে। শরয়ী পর্দা না মেনে বলে, 'দ্বীন সহজ।' গান-বাজনা শোনা হতে বিরত না হয়ে বলে, 'দ্বীন সহজ।' ইত্যাদি।

কট্টরপন্থীরা দ্বীনকে মানুষের সামনে কঠিন ক'রে পেশ করে। ফলে নিজেদের আমলে দ্বীনের প্রতি মানুষের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। এরা প্রচুর আমল করে; কিন্তু তা সঠিক কি না---সে খেয়াল রাখে না। দ্বীনের ব্যাপারে প্রচুর চেষ্টা করে; কিন্তু তা অপচেষ্টা কি না---তা ভেবে দেখে না।

এই শ্রেণীর অনেক মুসলমানই সংসার-বিরাগী হয়ে ভাল খাওয়া বর্জন করে, বিবাহ অথবা স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ করে, ছেলেমেয়েদের সঠিক তরবিয়ত দানে বিরত থাকে, চাষাবাদ অথবা উপার্জনের পথ ত্যাগ করে। অতঃপর ধীরে ধীরে তাদের মনে অমূলক বিশ্বাস বাসা বাঁধে, তাদের আমলে কুসংস্কার ও বিদআত স্থান ক'রে নেয়, সূফীবাদের নানা কর্মকান্ড তাদের আচরণে আত্মপ্রকাশ করে, সন্ন্যাসবাদ ও গুরুবাদের প্রভাব

তাদের আমলে প্রকট হয়ে ওঠে। অনেকের মনে কট্টরবাদ ও সন্ত্রাসবাদ জায়গা ক'রে নেয়। আর এ সবকিছু হয়, দ্বীনের সরলতার বিধানকে দৃষ্টিচ্যুত করার ফলে।

(গ) সরলতার বিধান প্রত্যাখ্যান করলে দাওয়াতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যেহেতু সরল মানুষকে সবাই পছন্দ করে, মিষ্টিভাষীকে সবাই ভালবাসে, সরল মন অপর মনকে সহজে জয় করে। ঐ দেখুন না, মহান প্রতিপালক তাঁর প্রেরিত নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

রহমতের নবী সেরূপই ছিলেন, মানুষের সাথে সরল আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন। আর তার জন্যই তাঁর দাওয়াতের এত বড় প্রভাব ছিল। কঠোর মানুষও তাঁর নিকট এসে নরম হয়ে যেত।

ঐ দেখুন না, এক যুবক প্রথম মসজিদে নামায পড়তে এল। তার নামায ছিল এলোমেলো, মাথায় টুপী ছিল না। ইমাম সাহেব বললেন, 'তোমার বাবা কোনদিন নামায পড়েছে? নামায না শিখেই নামায পড়তে চলে এসেছ?'

পরের ওয়াক্তে সে আর মসজিদ আসে নি।

আর এক যুবক নামায পড়তে এলে ইমাম সাহেব পরীক্ষা নিয়ে দেখলেন, একটা নিয়তও মুখস্থ নেই। তিনি বললেন, 'নিয়ত ছাড়া নামায হয় না। প্রত্যেক নামাযের নিয়ত আগে মুখস্থ কর, তারপর নামায পড়তে এসো!'

বেচারী নিয়তের এত চাপ দেখে আর নামাযই ধরল না।

এক অমুসলিম মুসলমান হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল; কিন্তু বলল, 'খতনা করতে পারব না।'

হুজুর ফতোয়া দিলেন, মুসলমানী না করলে মুসলমান হওয়া যায় কি ক'রে?

লোকটি আর মুসলমান হল না।

এক অমুসলিম মহিলা মুসলমান হতে আগ্রহী হয়ে বলল, 'বোরকা পরতে পারব না।' হুজুর বললেন, 'তা হলে মুসলমান হয়ে লাভ কি?'

এক কিশোর বাংলা স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় পড়তে এল। হুজুর বললেন, 'চুল ছোট ক'রে আসবি, যেন আঙ্গুল দিয়ে ধরা না যায়। আর সার্ট-ফার্ট পরা হবে না।'

ছেলেটি আর মাদ্রাসাই এল না।

এইভাবে কত শত দ্বীনের দাঈ সরলতার বিধান থেকে দূরে সরে কত শত মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। সহজটাকে কঠিন ক'রে এবং বৈধটাকে অবৈধ ক'রে মানুষের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে। এই শ্রেণীর দ্বীনের দাঈ অবশ্যই দ্বীনের সঠিক মতাদর্শ হতে বহু দূরে।

অথচ দাঈর উচিত, হিকমতের সাথে সহজতর আমল গ্রহণ করা ও করতে আদেশ করা; যেমন মহানবী ﷺ করতেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

দাওয়াতের ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করলে মানুষ দ্বীন থেকে সরে যায়। আর এই জন্য মহানবী ﷺ-এর আদর্শ ছিল সরলতা ও উদারতা। আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী ﷺ বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" *(বুখারী)*

সরল ও উদার নীতি যে অবলম্বন করে, সে দাওয়াতে সফল দাঈ এবং পরকালেও সফল। ইবনে মাসঊদ ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সে সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না কি, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, সহজ ও সরল।" *(তিরমিযী)*

দ্বীনের খেলাপ নয়, বরং মনের ও মতের খেলাপ হলেই অনেক দাঈ এঁটে বসেন।

তাঁর মতটাই ঠিক, অন্যেরটা বেঠিক। অনেক সময় বিপক্ষ কোনদিকে ছোট হলে বড়র মনে তখন অহংকার ধরে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন নিজেকে ছোট ভাবেন, মানুষের মনে গদি যাওয়ার ভয়ে তখন উঠে-পড়ে লাগেন। হারিয়ে যাওয়া জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য 'ডুবতে হুয়ে কো তিনকে কা সাহারা' নেন এবং সহজটাকে কঠিন বানান। প্রয়োজনে বিপক্ষকে 'সরকারের দালাল' বা 'কাফের' ফতোয়া দিতেও দ্বিধা করেন না। অনেক সময় দৈহিক বা পারিবারিক ত্রুটি প্রচার ক'রে জনসমক্ষে বিপক্ষকে ছোট ও বীতশ্রদ্ধ করার অপচেষ্টা করেন। আর অনেক সময় ত্রুটি না পেলে অপবাদ রচনা ক'রে রটনা করেন! আলাইহিম মিনাল্লাহি মা য়্যাস্তাহিক্কুন।

কেউ যদি ভাল ও অধিক ভালর মধ্যে ভালটাকে গ্রহণ করে, তাহলে তাঁর মনে আর স্বস্তি আসে না, কারণ তা তাঁর ফতোয়ার খেলাপ। তখন গোঁড়ামি শুরু করেন, কঠোরতা অবলম্বন করেন, কুরআন-হাদীসের বাণীর অপপ্রয়োগ করেন এবং অনেক সময় মশা মারতে কামান দাগেন।

অথচ মহানবী ﷺ আদর্শ ছিল, "তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।" *(বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং)*

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

(ঘ) এই শ্রেণীর দাঈরা আল্লাহর নবী ﷺ-এর দল থেকে খারিজ হতে পারেন। যেহেতু এঁরা যেন আমলে ও বুঝে তাঁকেও অতিক্রম করতে চান! যার জন্য তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বৈমুখ হবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি

অতির কিছু ভাল নয়, অতির মধ্যে ক্ষতি। কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি ভাল নয়, ভাল নয় সীমালংঘন, গন্ডি অতিক্রম।

কোন মহিলা ঠোঁটে হাল্কা লাল বা গোলাপী রঙ দিলে ভাল লাগে। বেশী দিলে বলে, 'ঠোসকী, ভাবুনী!'

অতি ভক্তি দেখালে বলা হয়, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

ভালবাসার জন্য বলা হয়, 'অতি পীরিত যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে। যাবে যদি নিত্যি, ঘটবে একটা কীত্তি। অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ।'

তরবিয়তের ক্ষেত্রে বলা হয়, 'নেবু কচলালে তেঁতো হয়। অতি নরম হয়ো না, নচেৎ বিলীন হয়ে যাবে। বেশী শক্ত হয়ো না, নচেৎ ভাঙ্গা যাবে।'

সংসারী জীবন-যাত্রায় অস্বাভাবিক হলে বলা হয়, 'অতি লোভে তাঁতি ডোবে।'

লেবু অনেক রকমের আছে। সবচেয়ে বেশী টকের লেবুকে 'গোঁড়া লেবু' বলা হয়।

আর ধর্ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, অজরুরী জিনিসকে যে জরুরী মনে ক'রে নিজে পালন করে ও অপরের উপর চাপিয়ে দেয়, মুস্তাহাবকে যে ফরযের দর্জা দিয়ে তা কেউ পালন না করলে তাকে দ্বীন-বিরোধী মনে করে, তাকে 'গোঁড়া' বলা হয়।

'গোঁড়া' কথার অর্থই হল, কঠোর অন্ধভক্ত, অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসী, অত্যধিক পক্ষপাতী, অতিভক্তি বা অন্ধভক্তির আবেগে আপ্লুত ব্যক্তি।

মহান প্রতিপালক ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ} (١٧١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। *(সূরা নিসা ১৭১ আয়াত)*

{ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } [المائدة : ٧٧]

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।' *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

অনুরূপ তিনি দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর নবী ﷺ ও মু'মিন বান্দাগণকে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (١١٢) سورة هود

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। *(সূরা হূদ ১১২ আয়াত)*

তিনি বানী ইস্রাঈলকে 'মান্ন' ও 'সালওয়া' দান ক'রে বলেছিলেন,

{كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} (٨١) سورة طـــه

অর্থাৎ, তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ পতিত হয়, সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। *(সূরা ত্বাহা ৮১ আয়াত)*

সীমালংঘনের শাস্তি ঘোষণা ক'রে তিনি বলেছেন,

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩)

অর্থাৎ, সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে, এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল। *(সূরা নাযিআত ৩৭-৩৯ আয়াত)*

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে শরীয়ত আমাদের সর্ববিষয়কে সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। সে সীমা অতিক্রম করাই হল শরীয়তের উপর বাড়াবাড়ি করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَــةً وَذِكْــرَى لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٥١) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, ওদের জন্য এ কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার (নবীর) উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ আছে। *(সূরা আনকাবূত ৫১ আয়াত)*

শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরেই রয়েছে মানুষের সার্বিক মঙ্গল। অবশ্য যারা এর উপদেশ গ্রহণ করে না অথবা তাতে বাড়াবাড়ি করে, তারা সে মঙ্গল ও

আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

কুরআন নিয়েও বাড়াবাড়ি করা যাবে না; কুরআন পড়ার ব্যাপারে, কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে, কুরআন মানার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা যাবে না, যেমন অবজ্ঞাও করা যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পড়, তোমরা তাতে বাড়াবাড়ি করো না এবং তা হতে দূরেও থেকো না, তার দ্বারা পেট চালায়ো না.....।" *(আহমাদ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩০৫৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী নয় এমন হাফেয এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করলে এক প্রকার আল্লাহকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

সুতরাং 'কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী' ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয়।

আমাদের দয়ার নবী ﷺ নিজের ব্যাপারেও অতিরঞ্জন পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি আমাদের সাইয়িদ (সর্দার)।' তা শুনে তিনি বললেন, "আস-সাইয়িদ (প্রকৃত সর্দার বা প্রভু) হলেন আল্লাহ।" তাঁরা বললেন, 'তাহলে আপনি মর্যাদায় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বদান্য ব্যক্তি।' তিনি বললেন, "তোমরা যা বলছ তা বল অথবা তার কিছু বল, আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (অসঙ্গত কথা বলতে) অবশ্যই ব্যবহার না করে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ,নাসাই, মিশকাত ৪৯০০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার উপর দরূদ পড়ো। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(আবূ দাউদ ২০৪২, সহীহুল জামে' ৭২২৬নং)*

হজ্জের সময় হাজীরা কত অতিরঞ্জন করে। সাতটি পাথর দ্বারা রম্ই জিমার করতে হয়; কিন্তু অনেকে তার থেকে বেশী পাথর ছুঁড়ে। পাথরগুলি সাইজে ছোলা থেকে একটু বৃহদাকার হবে। কিন্তু অনেকে মনে করে শয়তানকে বাঁধা পেয়ে শায়েস্তা করবে, তাই বড় আকারের পাথর ছুঁড়ে, কেউ কেউ জুতা, ছাতা এবং পানির বোতল ইত্যাদি ছুঁড়ে!

হজ্জে মহানবী ﷺ রম্ইর পাথরের সাইজ দেখিয়ে দিয়ে বড় পাথর মারতে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "তোমরা এই রকম পাথর মারো। হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের

ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকো। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম প্রমুখ)*

'যত কষ্ট, তত সওয়াব' কথাটা ঠিক হলেও নিজে নিজে কষ্ট সৃষ্টি ক'রে তা সহ্য করা এবং সওয়াবের আশা করা ভুল। ধরে নিন, মসজিদে গেলেন নামায পড়তে। সেখানে প্রচণ্ড গরম। আপনি বেশী সওয়াবের আশায় এসি-ফ্যান বন্ধ ক'রে নামায পড়তে লাগলেন। এতে কিন্তু সওয়াব নেই। একেই বলে 'তাকাল্লুফ', ইচ্ছাকৃত কষ্ট ভোগ করা। হ্যাঁ, যদি কারেন্ট চলে যায় এবং তার ফলে প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও আপনি মসজিদে নামায পড়েন, তাহলে কষ্টের জন্য বেশী সওয়াবের আশা করতে পারেন।

একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বলল, 'আবূ ইসরাঈল, সে এই নযর মেনেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা পালন করবে!' এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ওকে আদেশ কর, যেন ও কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং রোযা পূরণ করে।" *(বুখারী, মিশকাত ৩৪৩০ নং)*

একদা তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে (মক্কার দিকে) হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর ব্যাপার কি?" বলল, 'পায়ে হেঁটে কা'বা-ঘর যাওয়ার নিয়ত করেছে!' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার এমন প্রাণকে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওহে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ার হয়েই মক্কা যাও। কারণ, আল্লাহ তুমি ও তোমার নযরের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৩১-৩৪৩২ নং)*

মক্কা বিজয়ের দিনে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহর কাছে এই নযর মেনেছি যে, তিনি যদি আপনার হাতে মক্কার বিজয় দান করেন, তাহলে আমি 'বাইতুল মাক্বদিস' (জেরুজালেমের মসজিদে) দুই রাকআত নামায আদায় করব।' এ কথা শুনে নবী ﷺ তাকে দু'বার বললেন, "তুমি এখানেই (কা'বার মসজিদেই) নামায পড়ে নাও।" *(আবূ দাউদ, দারেমী, মিশকাত ৩৪৪০ নং)*

একদা তিন ব্যক্তি মহানবী ﷺ এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট উপস্থিত হল। যখন তাঁর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলা হল, তখন তারা তা কম মনে করল এবং বলল, 'নবী ﷺ-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন।' অতঃপর একজন বলল, 'আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়তে থাকব।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা রোযা রাখতে থাকব; কখনও রোযা ত্যাগ করব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা স্ত্রী থেকে দূরে থাকব;

কখনো বিবাহ করব না।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সেই সকল লোক, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের থেকে অধিকরূপে ভয় করে থাকি এবং তাঁর জন্য অধিক সংযম অবলম্বন ক'রে থাকি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোন দিন রোযা ছেড়েও দিই। (রাত্রে) নামাযও পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫নং)*

মহানবী ﷺ এর সাহাবাগণও দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। একদা হজ্জে গিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলাকে লক্ষ্য করলেন, সে মোটেই কথা বলে না। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, ও কথা বলে না কেন?' লোকেরা বলল, 'ও নীরব থেকে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছে।' তিনি সেই মহিলাকে সরাসরি বললেন, 'তুমি কথা বল। এমন কর্ম বৈধ নয়। এমন কর্ম জাহেলিয়াত যুগের!' এ কথা শুনে মহিলা কথা বলতে শুরু করল। *(বুখারী ৩৮-৩৪ নং)*

চরমপন্থা কোন বিষয়েই ভালো নয়, যেমন ভালো নয় একেবারে নরম, ঢিলে ও এলো পন্থা। প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যমপন্থাই হল একজন পূর্ণ আদর্শবান মুসলিমের অনুসরণীয় পথ। পক্ষান্তরে চরম ও নরমপন্থীরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। আলী ﷺ বলেন, 'আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।' *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৯৮ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

তিনি ইবাদতের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি ও আত্মকষ্ট পছন্দ করতেন না। একদা তিনি

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে।' *(বুখারী-মুসলিম)*

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ ক'রে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা ক'রে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

ইবাদতে আত্মযাতনায় নিজের ক্ষতি আছে অথচ অতিরিক্ত কোন সওয়াবও নেই। একদা মহানবী ﷺ তিন তিনবার বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। *(রিয়াযুস স্বালেহীন)*

একদা নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা ক'রে বাঁধা রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, "এই দড়িটা কি (জন্য)?" লোকেরা বলল, 'এটি যয়নাবের দড়ি। যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান।' নবী ﷺ বললেন, "এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে স্ফূর্তি থাকাকালে নামায পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "যখন নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারো ঢুল আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি ঢুল অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি দিচ্ছে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ইবাদত ইসলামের বিধান নয়।

একজন বিবাহ করেননি, কারণ তাতে তিনি বড় আবেদ হতে পারবেন।

এক দম্পতি বিবাহের পর মোটেই বা বেশী সন্তান নেন না, কারণ তাতে তাঁদের ইবাদতের ডিষ্টার্ব হবে!

এক স্বামী তাঁর স্ত্রীর প্রতি ততটা ভ্রূক্ষেপ করেন না, কারণ তাতে তাঁর (রাতের) ইবাদতে ক্ষতি হয়।

এক স্ত্রী বেশী বেশী রোযা রাখেন, রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন, স্বামী বিছানায় ডাকলেই ইবাদতে ক্ষতি হওয়ার কথা বলেন।

এক আবেদের বাড়ির দরজা সর্বদা বন্ধ। কারণ মানুষের যিয়ারতে তাঁর ইবাদতে ক্ষতি হয়।

এক আবেদের মোবাইল প্রায় বন্ধ থাকে, অথবা রিসিভ করেন না, কারণ তাঁর ইবাদতে ক্ষতি হয়।

এক আবেদ পরিবারের চলার মত উপার্জন করেন না, কারণ তাতে তাঁর ইবাদতে ক্ষতি হয়।

এই শ্রেণীর অনেক কিছুই এক প্রকার বৈরাগ্যবাদ। সংসারের সাথে এইভাবে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ইবাদত ইসলামে কাম্য নয়।

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়---
লভিব মুক্তির স্বাদ....।'

ইসলাম আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দেয়। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় না যে, ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে বনে-জঙ্গলে অথবা মসজিদে বসে তপস্যা করি।

ইসলাম শিক্ষা দেয় না যে, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দিয়ে মসজিদে অথবা আঁধার ঘরে কেবল 'আল্লাহ-আল্লাহ' করি।

ইসলাম শিক্ষা দেয় বিবাহ করতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয় সংসার করতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করতে, কারণ তা ইবাদত এবং এক প্রকার 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

ইসলাম শিক্ষা দেয় স্বামীর খিদমত করতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয় সন্তান লালন করতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয় মেহমান-নেওয়াযী করতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয় মানুষের সাথে ওঠা-বসা করতে, মানুষকে ভাল শিক্ষা দিতে, কারণ তা ইবাদত।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, মুসলিম সংসার-বিরাগী হবে না। সর্বকাজে আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে ঠিকই; কিন্তু তদবীর করতে অবশ্যই ভুল করবে না।

আবূ জুহাইফা অহব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে

বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, 'আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি এ কথা বলছ?" আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি বললেন, "তুমি এর সাধ্য রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে।" আমি বললাম, 'আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু'দিন রোযা ত্যাগ কর।" আমি বললাম, 'আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে একদিন রোযা রাখ আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল দাউদ ﷺ-এর রোযা আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "এটা সর্বোত্তম রোযা।" কিন্তু আমি বললাম, 'আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এর চেয়ে উত্তম রোযা আর নেই।" (আব্দুল্লাহ বলেন,) 'যদি আমি রসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের

অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন ক'রে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।" আমি বললাম, 'দাউদের রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, "অর্ধেক জীবন।" অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, 'হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!'

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।" আমি বললাম, '(সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া অন্য কিছু নয়।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখ। কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ, এর চাইতে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন ক'রে দেওয়া হল। আর নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, "তুমি জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।" আব্দুল্লাহ বলেন, 'সুতরাং আমি ঐ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বুড়ো হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ ক'রে নিতাম।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে---।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ, রোযা বিফল যাবে) সে সর্বদা রোযা রাখবে।" এ কথা তিনি তিনবার বললেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে দাউদ ﷵ-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নামায হচ্ছে দাউদ ﷵ-এর নামায। তিনি মধ্য রাতে শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন করতেন না।"

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ বিন আম্র) বলেন, আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধুর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলত, 'এত ভালো লোক যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ, মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি।)' যখন এই আচরণ অতি লম্বা হয়ে গেল, তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী ﷺ-কে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, "তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।" সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কিভাবে রোযা রাখ?" আমি বললাম, 'প্রত্যেক দিন।' তিনি বললেন, "কিভাবে কুরআন খতম কর?" আমি বললাম, 'প্রত্যেক রাতে।' অতঃপর তিনি ঐ কথাগুলি বর্ণনা করলেন, যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) ঐ সপ্তম অংশ পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন, যেন তা (রাতে পড়া) তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যখন তিনি (দৈহিক) শক্তি সঞ্চয় করার ইচ্ছা করতেন, তখন কিছুদিন রোযা রাখতেন না এবং গুনে রাখতেন ও পরে ততটাই রোযা রেখে নিতেন। কারণ, তিনি ঐ আমল পরিত্যাগ করা অপছন্দ করতেন, যার উপর তিনি নবী ﷺ থেকে পৃথক হয়েছেন। *(রিয়াযুস স্বালেহীন)*

উসমান বিন মাযউন ؓ অনুরূপ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হে উসমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদে আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?" উসমান বললেন, 'না হে আল্লাহর রসূল!' তিনি

বললেন, "আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও তালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উসমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।" *(আবূ দাউদ প্রমুখ)*

উক্ত উসমান বিন মাযউন ও তাঁর কিছু সঙ্গী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটানা রোযা রাখতে, রাতভর নামায পড়তে, খাসি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। দিনে খাওয়া ও রাতে ঘুমানোকে নিজেদের জন্য হারাম ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এ কাজ আল্লাহর নৈকট্যদানকারী। কিন্তু তা ছিল আসলে তাঁদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিষেধ ক'রে বললেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٨٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। *(সূরা মাইদাহ ৮৭ আয়াত)*

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু (খাদ্য, পানীয়, ঘুম ও স্ত্রী-সম্ভোগ) বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না এবং (খাসি ক'রে) সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ (হালাল জিনিস হারাম ক'রে ও খাসি ক'রে) সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।

মানুষের নিকট থেকে এ প্রার্থনীয় নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে বসে থাকবে। বরং সে যে কাজই করুক, সেই কাজকে ইবাদতে পরিণত করার চেষ্টা করবে। দুনিয়ার কাজ হলেও তা নিয়ত ও পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলিম নিজ জীবন ও মরণকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। তাছাড়া দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজও বর্জনীয় নয়। স্ত্রী-সন্তান-সুখও অবাঞ্ছিত নয়। সময় মত দ্বীনের কাজ এবং সময় মত দুনিয়ার কাজ করেই মুসলিমকে ইহ-পরকাল জয় করতে হবে।

হান্যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ؓ বলেন, একদা আবূ বাকর ؓ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!' তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কি

কথা বলছ তুমি?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবূ বাক্র ؓ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবূ বাক্র গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কি কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি তখন, আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান, যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই।' (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাক, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাক, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। *(মুসলিম)*

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হল যে, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বা সীমাবদ্ধ কর্মে সীমালংঘন করা অথবা অবহেলা ক'রে কিছু হ্রাস বা বর্জন করা বৈধ নয়। আরবী কবি বলেছেন,

لا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد ... كلا طرفي قصد الأمور ذميمُ

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি করো না। মধ্যপন্থার উভয় প্রান্তই হল নিন্দনীয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত মান আছে। কোন ব্যক্তিকে তার সেই মান-মাত্রার ঊর্ধ্বে উত্তোলন করা যাবে না; যেমন তার নিম্নে অবতারণও করা যাবে না। কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়; যেমন কারো বদনাম থাকলে তাতেও বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়। এ সবই এক এক প্রকার সীমালংঘন।

আলোচনা থেকে আরো বুঝা যায় যে, মধ্যপন্থা, নির্ধারিত সীমা বা মানমাত্রাও হবে শরীয়ত। কোন ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞান বা ধারণা বা খেয়াল-খুশী মধ্যপন্থার মানদন্ড হতে পারে না।

একজন মুসলিম মহিলা বগলকাটা ব্লাউজ পরে মাথা খুলে ঘুরে বেড়ায়। একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক বলবে, সভ্য মেয়ে, আধুনিকা ও আলোকপ্রাপ্ত মেয়ে।

একজন মহিলা মাথায় কাপড় বা ওড়না দিয়ে চলাফেরা করে। সাধারণ মানুষ ভাবে, এই হল মধ্যমপন্থী মেয়ে।

একজন মহিলা বোরকা পরে, কিন্তু মুখে পর্দা নেয় না। একেও অনেকে মধ্যমপন্থী বলতে পারে।

এক মহিলা বোরকা পরে, কিন্তু সে নির্লজ্জ চরিত্রহীনা। নিশ্চয় তাকে কেউ চরমপন্থী ভাববে না।

একজন মহিলা বোরকা পরে এবং মুখ ঢেকে পর্দা করে। একে অনেকে কড়াপন্থী বলতে পারে।

একজন মহিলা বোরকা পরে এবং মুখ ঢেকে পর্দা করে, আর সেই সাথে কোন গায়র মাহরামকে দেখা দেয় না। অনেকের মতে সে হল চরমপন্থী।

একজন মহিলা বোরকা পরে এবং মুখ ঢেকে পর্দা করে, সকল গায়র মাহরাম থেকে পর্দা করে, ঘর থেকে সহজে বের হয় না, বাসে-ট্রেনে চড়ে না। একে তো লোকে চরমপন্থী বলবেই।

কে বলবে কোন্ মহিলাটি মধ্যমপন্থী? একজন দর্জি, না একজন কবিরাজ? একজন ডাক্তার, না একজন মাষ্টার? একজন সাংবাদিক, না একজন ব্যারিষ্টার? একজন অভিনেতা, না একজন অভিনেত্রী?!

আলেম বললেও আলেমও তো নরম-চরম ও মধ্যমপন্থী আছে। কোন্ আলেম মধ্যমপন্থী, তাও নির্ধারণ করা শরীয়তেরই কাজ। ঠিক ঐ চায়ের হাল্কা মিষ্টি, কড়া মিষ্টির মত, আর সে কথা আমার 'যুব-সমস্যা'য় আলোচিত হয়েছে।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন, ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ বিদআত।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন, ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ বিদআত। যে করবে সে বিদআতী এবং সে জাহান্নামে যাবে। তাকে ইমামতি করতে দেওয়া হবে না।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন, ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ জায়েয। না করলে কোন সমস্যা নেই।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন, ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ সুন্নত। যে করবে না, সে ধর্মবিরোধী এবং সে জাহান্নামে যাবে। তাকে ইমামতি করতে দেওয়া হবে না।

সুতরাং দলীলই প্রমাণ করবে, কে মধ্যমপন্থী ও কে নেহাতই গোঁড়া। শরীয়তের মানদণ্ডে হক্কানী উলামাগণ বলতে পারবেন, গোঁড়ামি কে করছে?

যেমন কোন্ সাইজের পাথর দ্বারা রম্ই-জিমার করলে শুদ্ধ হবে এবং কোন্ সাইজের পাথর মারলে বাড়াবাড়ি হবে, তার ফায়সালা দিয়েছিলেন মহানবী ﷺ।

কিন্তু বড় আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে, ইসলামের ভাল-মন্দ নিয়ে মিডিয়ায় বসে চর্চা করে এমন মানুষ, যার ইসলাম সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা নেই, যে ইসলামকে পূর্ণরূপে মানে না। এইভাবে কত শত কানা বলে নাচে ভাল, কালা বলে গায় ভাল!

একবার আমার অফিসের একটি তর্ক মনে পড়ে, এক উর্দু-ওয়ালা বলল, 'উর্দু ভাষা সবচেয়ে বেশী মিষ্টি ভাষা।'

এক বাঙ্গালী শুনে বলল, 'বাংলার মত নয়। বাংলা সবচেয়ে বেশী মিষ্টি ভাষা।'

একজন কেরল বলল, 'ধুৎ, কেরলের ভাষা সবচেয়ে মধুর।'

এইভাবে তর্ক হল। সবাই নিজ নিজ দইকে বেশী মিষ্টি বলল। বলতে পারেন, এর ফায়সালা কে দিতে পারে? যার নিজের ভাষা ছাড়া অপর ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, সে তুলনামূলক কোন্টা বেশী ভাল, তা বিচার করতে কি সক্ষম?

একদা মহিষাডহরী মাদ্রাসায় এক মাষ্টার মশায় ছাত্র হয়ে হাফেযী পড়তে এলেন। তিনি কথায় কথায় ইংলিশ বলতেন। সকলেই বলল, 'আরে ইংরেজীতে বাগ্মী!' অথচ যারা এ মন্তব্য করেছিল, তারা ইংরেজীর 'ইং' ও জানত না। এক জুমআর পরে তিনি ইংরেজীতে বক্তব্য রাখলে মাষ্টার আব্দুল্লাহিল কাফী সাহেব প্রকৃত খবর বললেন।

অনুরূপ অনেকে এক আলেমকে অন্য আলেমের উপর অসীম শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। যাঁকে চেনে তাঁকে তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে, যাঁর সম্বন্ধে সে মোটেই ধারণা রাখে না। অথচ যে ব্যক্তি উভয়কেই সমানভাবে চেনে, সেই বলতে পারবে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কে?

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কাকে বলে, সে ব্যাপারে উলামাগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, 'শরীয়ত যা চায়, তার থেকে অতিরিক্ত করাই হল বাড়াবাড়ি। *(আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী ১/১২৫)*

ইবনে হাজার বলেছেন, 'তা হল কোন জিনিসে অতিরঞ্জন করা, সীমা ছাড়া কঠিনতা করা। আর তাতে রয়েছে গভীর রহস্য খোঁজার অপচেষ্টা করার অর্থ।' *(ফাত্হ ১২/৩০১)*

আল-মুনাবী বলেছেন, 'তা হল সীমা অতিক্রম করা।' *(আত্-তাআরীফ ১/৫৪০)*

মোটকথা বলা যায় যে, মহান আল্লাহর সহজ বিধানকে কঠিন ক'রে পালন করার নাম হল, বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন বা গোঁড়ামি। কোন আমলের স্বাভাবিকতা লংঘন ক'রে অস্বাভাবিকরূপে পালন করা হল বাড়াবাড়ি।

الغلو এর প্রায় কাছাকাছি অর্থের আরো দু'টি শব্দ রয়েছে التعمق ও التنطـــع । এ দু'টির মানেও গভীরতায় যাওয়া, বেশী বাড়াবাড়ি করা। একদা নবী ﷺ মাসের শেষাংশে সওমে-বিসাল করলেন। তা দেখে কিছু লোক বিসাল করতে লাগলেন। (অথচ তা নিষিদ্ধ।) নবী ﷺ-এর কাছে সে খবর গেলে তিনি (ধমক স্বরূপ) বললেন, "মাস লম্বা হলে আমি এমন বিসাল করতাম যে, অতিরঞ্জনকারীরা তাদের অতিরঞ্জন ছেড়ে দিত। আমি তোমাদের মত নই। আমাকে আমার প্রতিপালক খাওয়ান ও পান করান।" *(বুখারী)*

একদা নবী ﷺ একদল লোকের পাশ দিয়ে পার হওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলে তারা সালামের উত্তর দিল না অথবা কথা বলল না। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলা হল, 'ওরা আজ কথা না বলার নযর মেনেছে অথবা কসম করেছে।' নবী ﷺ বললেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে (অথবা ধ্বংস হোক)। *(মুস্বান্নাফ আব্দুর রায্যাক)*

'মুতাআম্মিকূন' ও 'মুতানাত্বিউন' হল তারা, যারা নিজেদের কথা ও কাজে সীমা লংঘন করে, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে। অনর্থক কোন কিছুর গভীরে পৌঁছনোর অপচেষ্টা করে। এরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত।

বাড়াবাড়ির কাছাকাছি আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে التـــشدد والتعنـــت والـــتحمس । এগুলির অর্থ প্রায় কাছাকাছি; প্রবল উদ্যম, অতিরিক্ত উৎসাহ, কঠোর উত্তাপ, কট্টর উদ্যোগ, উদগ্র সাধনা ইত্যাদি।

অনুরূপ আরো একটি শব্দ التطـــرف। এর অর্থ ঃ শেষ প্রান্তে পৌঁছনো, অর্থাৎ, চরমপন্থী হওয়া।

ইসলাম মধ্যপন্থী ধর্ম। ইসলামে চরমপন্থা নেই।

একদা মহানবী ﷺ তিন তিনবার বলেছেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে

কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, 'তোমরা বিদআত রচনা করা হতে সাবধান থেকো, অতিরঞ্জন করা হতে সাবধান থেকো, তোমরা অতি গভীরতার পিছনে পড়া হতে সাবধান থেকো এবং তোমরা প্রাচীন দ্বীন অবলম্বন করো।' *(ই'লামুল মুআক্কিঈন ৪/ ১৫০)*

দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করার কুফল

দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ নানা কুফল পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্যই অতিরিক্ত জিনিসের বাড়তি প্রভাব আছে, প্রতিক্রিয়া আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

অথচ তাতে অতিরিক্ত কিছু করলে কি কোন প্রভাব পড়বে না? অবশ্যই।

বাড়াবাড়ির ফলে যে সকল প্রভাব পড়তে পারে, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। বাড়াবাড়ির ফলে বিদআত সৃষ্টি হয়।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদতকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট ক'রে অতিরিক্ত করলে তা বিদআত রূপে পরিগণিত হয়। অথচ শরীয়ত আমাদেরকে বিদআত রচনা করতে নিষেধ করেছে এবং বলেছে যে, "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

খেয়াল রাখার বিষয় যে, শরীয়ত আমাদেরকে 'বেশী আমল' করার চাইতে 'ভাল আমল' করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(সূরা মুল্‌ক ২ আয়াত)*

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (٣٠) الكهف

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। *(সূরা কাহফ ৩০ আয়াত)*

পরন্তু ভাল হলেই কোন জিনিস অতিরিক্ত করা যায় না। ফজরের নামায ভাল বলেই চার রাকআত পড়া যায় না। 'যত ধোবে, তত ভাল' বলে ওযূর অঙ্গ তিন বারের বেশি অথবা সাবান দিয়ে ধোয়া যায় না। কারণ সে অতিতে ক্ষতি হবে।

সুতরাং আমল 'বেশী' করার চাইতে তা 'ভাল' করার অধিক প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। আর আমল ভাল হবে তখন, যখন তাতে দু'টি শর্ত পাওয়া যাবে ঃ ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদী। পরন্তু যারা এর উপরে নিজের অথবা অন্য কারো তরীকা দ্বারা অতিরিক্ত করবে, তার আমল 'বেশী' হবে ঠিকই, কিন্তু 'ভাল'র মাপকাঠিতে মন্দ হয়ে যাবে।

ফাযায়েলে আ'মালও বেশী করা ভাল নয়; যদি তা যয়ীফ হাদীস ছাড়া কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত না হয়। আমলের জন্য কি সহীহ হাদীস যথেষ্ট নয়?

যেমন 'বিদআতে হাসানা' বলে কোন ভাল বিদআত নেই। অর্থাৎ, বিদআতে হাসানাও ভ্রষ্টতা। কারণ মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক বা সমস্ত বিদআতই ভ্রষ্টতা।"

সাহাবী ইরবায বিন সারিয়াহ رضي الله عنه বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন, যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রু বহমান হল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন।' তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি! যদিও বা তোমাদের আমীর একজন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে, তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতত্রব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দন্ত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) আর (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

অতিরঞ্জনকারীরা বিদআতকে দ্বীন মনে করে। বিদআত বর্জন করতে বললে, তারা

মনে করে, দ্বীনের কোন অংশ বাদ দিতে বলে। তারা বলে, 'কম্বলের রোঁয়া বাছতে বাছতে কম্বলই শেষ হয়ে যাবে!' অর্থাৎ, তাদের নিকট দ্বীনের হালাল, হারাম, ফরয, সুন্নত, বিদআত সব একাকার!

অথচ বিদআত হল অতিরিক্ত জিনিস। বিদআত-বিরোধীরা নখ কেটে ফেলতে বলেন, আঙ্গুল নয়। অতিরিক্ত চুল কেটে ফেলতে বলেন, মাথা বা দেহের অংশ নয়। ফসলের আগাছা-পরগাছা তুলে ফেলতে বলেন, ফসল নয়। গাঁটের নিচে ঝুলন্ত পায়জামার অংশ কেটে ফেলতে বলেন, পায়ের অংশ কেটে আণ্ডার-প্যান্ট্ করতে নয়।

অতিরঞ্জনকারীরা জায়েয ও সুন্নতকে ফরয জ্ঞান করে। যেমন টুপীকে 'শেয়ারে ইসলাম' জ্ঞান করে! মাথার চুল একেবারে ছোট করা ফরয মনে করে!

২। বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন উম্মাহর ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকো। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম প্রমুখ)*

৩। বাড়াবাড়িতে রয়েছে খ্রিষ্টানদের অনুকরণ।

খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মে বহু বাড়াবাড়ি করেছে। ঈসা عليه السلام-কে আল্লাহর পুত্র তথা আল্লাহ বানিয়ে ছেড়েছে। ধর্মে সন্ন্যাসবাদ তারাই রচনা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}

অর্থাৎ, কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

সুতরাং যে মুসলিম তার ধর্মে বাড়াবাড়ি করবে, সে হবে খ্রিষ্টানদের অনুকরণকারী।

৪। বাড়াবাড়ি করলে সরল দ্বীনের সরাসরি বিরোধিতা হয়।

আল্লাহ বলেন, "বাড়াবাড়ি করো না।"

অতিরঞ্জনকারী বলে, 'বেশী আমল করলে তুমি বেশী সন্তুষ্ট হবে।'

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হোক।"

অতিরঞ্জনকারী বলে, 'ভক্তি বেশী হলে ভক্তিভাজন বেশী খোশ হবে।'

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "দ্বীন সরল-সহজ।"

অতিরঞ্জনকারী বলে, 'কষ্ট যত, সওয়াব তত।'

শরীয়ত বলে, 'নরমভাবে সরলভাবে মানুষকে দাওয়াত দাও।'

অতিরঞ্জনকারী বলে, 'দ্বীন কি এতই দুর্বল?'

এইভাবে শতভাবে অতিরঞ্জনকারী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে। সুতরাং সে কি ধ্বংসের উপযুক্ত নয়?

৫। বাড়াবাড়িতে রয়েছে অযথা নিজেরই কষ্ট।

নিজের তরফ থেকে কষ্ট সৃষ্টি ক'রে অকারণে তা বরণ করায় নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কি আছে?

মহানবী ﷺ বলেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

একদা মহানবী ﷺ তিন তিনবার বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" *(বুখারী)*

শুধু নিজেরই কষ্ট নয়, বাড়াবাড়িতে নিজের বংশধরদেরও কষ্ট আছে। বিশেষ ক'রে দানশীলতায় বাড়াবাড়ি করলে সে কষ্ট স্পষ্ট হয়। এ জন্যই কুরআন আমাদেরকে সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ ক'রে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে আদেশ দেয়, মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}

অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৯ আয়াত)*

সা'দ বিন আবী অক্কাস رضي الله عنه বলেন, আমি বিদায়ী হজ্জের সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সেখানে এমন ব্যাধিগ্রস্ত হলাম যাতে আমি নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী মনে করলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে

আল্লাহর রসূল! আমার ধন-মাল তো অনেক বেশী। আর একটি কন্যা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি কি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করতে পারি?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তবে অর্ধেক মাল?' বললেন, "না।" 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ এক তৃতীয়াংশ করতে পার। তবে এক তৃতীয়াংশও বেশী। হে সা'দ! তুমি তোমার ওয়ারেসীনদেরকে লোকদের নিকট হাত পেতে খাবে এমন দরিদ্র অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনীরূপে ছেড়ে যাওয়া অনেক ভালো।" *(বুখারী ১২৯৫, মুসলিম ১৬২৮নং প্রমুখ)*

৬। বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের মাধ্যমে অপরকে দ্বীন থেকে বীতশ্রদ্ধ ক'রে তোলা হয়, মানুষের মনে দ্বীনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা হয়।

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি ফজরের নামাযে অমুকের কারণে হাজির হই না; সে আমাদের নামায খুব লম্বা ক'রে পড়ায়।' আবূ মাসঊদ ﷺ বলেন, 'এর পর সেদিন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ওয়াযে যেরূপ রাগান্বিত হতে দেখেছি, সেরূপ আর অন্য কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ লোকদেরকে (জামাআতের প্রতি) বীতশ্রদ্ধ ক'রে তোলে। তোমাদের যে কেউ কোন নামাযের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ ক'রে পড়ে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও (বিভিন্ন) প্রয়োজন-ওয়ালা লোক আছে।" *(বুখারী ৭০২নং, মুসলিম)*

৭। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে মুসলিম দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে; যেমন খাওয়ারিজরা হয়েছে।

একদা নবী ﷺ কিছু মাল বন্টন করছিলেন। এমন সময় ইবনু যিল খুয়াইসিরাহ তামীমী এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায়ভাবে বন্টন করুন।' নবী ﷺ বললেন, "সর্বনাশ হোক তোমার! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে, আর কে করবে?" উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।' তিনি বললেন, "ছেড়ে দাও ওকে। ওর আরো সঙ্গী আছে। যাদের নামাযের কাছে, তোমাদের কারো নামাযকে তুচ্ছ জানবে, যাদের রোযার কাছে, তোমাদের কারো রোযাকে নগণ্য জানবে! তারা দ্বীন থেকে সেই রকম বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।...." *(বুখারী, মুসলিম)*

খাওয়ারিজরা ধর্মে অতিরঞ্জন ক'রে তৃতীয় খলীফা উসমান ﷺ-কে খুন করেছিল।

আর তখন থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

চারিদিকে ফিতনার তুফান বয়ে চলেছিল। আলী ﷺ খলীফা হওয়ার পর তা সামাল দেওয়ার চেষ্টাই করছিলেন। কিন্তু যে আগুন জঙ্গলে লাগে এবং যার পিছনে বাতাস থাকে, তাকে নিভিয়ে ফেলা তত সহজ নয়।

ফিতনার দাপট থেকে রেহাই পাওয়ার মানসে আলী ﷺ মদীনা ছেড়ে ইরাকের কূফা শহরের বাসিন্দা হলেন। ছিন্নভিন্ন উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায়? শামবাসীদের মত পৃথক, মিসরবাসীদের রায় আলাদা, হিজাযবাসীদের মত ভিন্ন। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা হতে লাগল। দুষ্কৃতীরা বেহেশতের সনদপ্রাপ্ত খলীফার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন ক'রে প্রচার করতে লাগল ঃ-

তিনি উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছেন।

তিনি তৃতীয় খলীফার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

তিনি জিহাদ বাতিল ক'রে দিয়েছেন।

তিনি নিজের নাম থেকে 'আমীরুল মু'মিনীন' মুছে দিয়েছেন।

তিনি (আয়েশার বিরুদ্ধে) জামাল যুদ্ধের দিন বন্দী না ক'রে যুদ্ধ করেছেন।

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে সালিস মেনেছেন। অথচ 'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই।'

আলী ﷺ তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিতনাগ্রস্ত রোগা হৃদয়ে তা গ্রহণযোগ্য হল না। অতঃপর ইবনে আব্বাস ﷺ ইয়ামানী সুন্দর পোশাক পরে হারুরা শহরে তাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের সংখ্যা তখন ছয় হাজার। ইবনে আব্বাস ﷺ-কে দেখে তাদের কেউ কেউ বলল, 'উনার সাথে কথা বলো না। উনি বড় বাগ্মী!' কেউ কেউ বলল, 'অসুবিধা কি? উনি কি বলছেন শুনব এবং আমরাও তাঁর সাথে কথা বলব।'

ইবনে আব্বাস ﷺ তাদের নিকটে এসে সালাম দিলেন। কিন্তু তারা সালামের উত্তর দিল না। তারা বলল, 'স্বাগতম! আপনার এ লেবাস কেন?'

তিনি বললেন, 'কেন? এর বিরুদ্ধে কি তোমাদের কোন অভিযোগ আছে? আল্লাহ রসূল ﷺ-কে সুন্দরতম লেবাসে দেখেছি।'

অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (৩২) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। *(সূরা আ'রাফ ৩২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূলের চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা ও আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে এসেছি। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কি?'

তারা বলল, 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে সালিস মেনেছেন, অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ} (৫৭) سورة الأنعام

অর্থাৎ, কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই। (সূরা আনআম ৫৭ আয়াত)

জামাল যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করেছেন, বন্দী করেননি এবং গনীমতের মালও সংগ্রহ করেননি। বিপক্ষ যদি কাফের ছিল, তাহলে তাদের ধন ও নারী আমাদের জন্য বৈধ ছিল। আর যদি তারা মুসলমান ছিল, তাহলে তাদের রক্ত আমাদের জন্য হারাম ছিল।

আর সালিসের দিন তিনি নিজের নাম থেকে "আমীরুল মু'মিনীন" মুছে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি "আমীরুল মু'মিনীন" না হন, তাহলে তিনি অবশ্যই "আমীরুল কাফিরীন"!

ইবনে আব্বাস বললেন, 'আর কিছু আছে?'

তারা বলল, 'এ তিনটিই যথেষ্ট।'

তিনি বললেন, 'আমি যদি আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ থেকে এ সকল অভিযোগের উত্তর দিই, তাহলে কি তোমরা মেনে নেবে?'

তারা বলল, 'বলুন, মানব।'

বললেন, 'তোমরা বলছ, উনি আল্লাহর দ্বীনে মানুষকে সালিস মেনেছেন। আল্লাহর কুরআনও তো সিকি দিরহাম খরগোশের ব্যাপারে মানুষকে সালিস মেনেছে। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ

مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ.....} (৯৫) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে, যা বধ করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার মীমাংসা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে...। *(সূরা মাইদাহ ৯৫ আয়াত)*

আর (বিবদমান) স্বামী-স্ত্রীর জন্য বলেছেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا} (৩৫) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর, তাহলে তোমরা ওর (স্বামীর) পরিবার হতে একজন এবং এর (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস প্রেরণ কর...। *(সূরা নিসা ৩৫ আয়াত)*

আল্লাহর দোহাই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, মানুষের রক্ত ও প্রাণ রক্ষা তথা তাদের আপোসে বিবাদ মিটানোর জন্য মানুষকে সালিস মানা বেশী যুক্তিযুক্ত, নাকি সিকি দিরহাম মূল্যের খরগোশ শিকারের ব্যাপারে সালিস মানা বেশী যুক্তিযুক্ত?'

তারা বলল, 'বরং মানুষের রক্ত ও প্রাণ রক্ষার জন্য সালিস মানা বেশী যুক্তিযুক্ত।'

বললেন, 'তাহলে এ বিষয়ের ইতি টানি?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'আর তোমরা বলছ, তিনি জামাল যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করেছেন, বন্দী করেননি এবং গনীমতের মালও সংগ্রহ করেননি। তোমরা কি চাইতে তোমাদের মা আয়েশাকে বন্দী করতে এবং অন্য দাসীর মত তাঁকে বৈধভাবে ব্যবহার করতে? অথচ তিনি তোমাদের মা! তা করলে তোমরা কাফের হয়ে যেতে। আর যদি বল, তিনি আমাদের মা নন, তাহলেও তোমরা কাফের হয়ে যাবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (৬) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ। *(সূরা আহযাব ৬ আয়াত)*

সুতরাং তোমরা দুই ভ্রষ্টতার মধ্যে একটির শিকার হবে। এখন এর উপায় তোমরাই বল। এ বিষয়ের ইতি টানব?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ।'

বললেন, 'সালিসের দিন তিনি নিজের নাম থেকে "আমীরুল মু'মিনীন" মুছে

দিয়েছেন, নবী ﷺও তো হুদাইবিয়ার দিন নিজের নাম থেকে "রাসূলুল্লাহ" মুছে দিয়েছিলেন। চুক্তিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা হয়েছিল। কুরাইশ বলেছিল, 'আমরা যদি তোমাকে আল্লাহর রসূল বলেই মানব, তাহলে বিবাদ কিসের? বরং "মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ" লেখ।' সুতরাং তিনি আলী ﷺ-কে আদেশ দিয়ে লেখা করিয়েছিলেন (অথবা তিনি নিজে লিখেছিলেন)। ইমারত কি নবুঅত থেকেও বড়?'

তারা বলল, 'না।'

বললেন, 'তাহলে অভিযোগ কিসের?'

এই যুক্তিপূর্ণ আলোচনার ফলে তাদের মধ্য হতে দুই হাজার লোক ফিরে এল। কিন্তু বাকী লোক বিদ্রোহী হয়েই থেকে গেল। আলী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। মহানবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী তারাই ছিল হত্যাযোগ্য জামাআত। *(হাকেম ৪/২০২, বাইহাক্বী ৫/১৬৫)*

নাহরাওয়ানে যুদ্ধ হল, তাদের বহু লোক হতাহত হল। কিন্তু তাতে তারা ক্ষান্ত হল না। মনের ভিতরে খলীফার প্রতি ক্ষোভ এবং তাঁকে হত্যা ক'রে বিরাট সওয়াবের আশা মনেই থেকে গেল।

সন চল্লিশ হিজরীর রমযান মাসে মক্কার হারামে তিনজন খারেজী একত্রে পরামর্শ করল, নাহরাওয়ানে সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। তারা সিদ্ধান্ত নিল, এই পবিত্র মাসে ভ্রষ্টদের তিন নেতা আলী, মুআবিয়া ও আম্র বিন আসকে হত্যা ক'রে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে! সুতরাং রাত জেগে ইবাদত ক'রে দিনে রোযা রেখে এক সময় তারা উক্ত সংকল্প নিয়ে একে অন্যকে কেঁদে বিদায় দিয়ে মক্কা ত্যাগ করল। আম্র বিন বুকাইর তামীমী মিসর রওনা হল আম্র বিন আস ﷺ-কে হত্যা করার জন্য। মিসর পৌঁছে সে তাঁকে ফজরের নামাযে খুন করার ফন্দি আঁটল। এক ফজরে সে ইমামকে ছোরা মেরেই বসল। কিন্তু আম্র ﷺ অসুস্থ থাকার কারণে সেদিন তিনি ফজরে আসেননি। তাঁর জায়গায় খুন হলেন তাঁর এক সিপাই। তামীমীও ধরা পড়ল এবং তাকে হত্যা করা হল।

বুরাক বিন আব্দিল্লাহ তামীমী শামে গিয়ে এক ফজরে মুআবিয়া ﷺ-কে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করল। তাতে তিনি গভীরভাবে আহত হলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁকেও বাঁচিয়ে নিলেন। বুরাক ধরা পড়লে, তাকে হত্যা করা হল।

আল্লাহর নবী ﷺ-এর জামাতা, হাসান-হুসাইনের পিতা, চতুর্থ খলীফা আমীরুল

মু'মিনীন আলী ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগেই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি কারো হাতে হত্যা হয়ে শহীদ হবেন। এই জন্য তিনি ফিতনার সময় কূফার রাস্তায় চলতে চলতে প্রায় বলতেন, 'ওহে আবূ তালেবের পুত্র!

أشدد حيازيمك للموت   فإن الموت لاقيك

ولا تجزع من الموت   إذا حل بواديك

অর্থাৎ, মৃত্যুর জন্য বেঁধে-ছেঁদে প্রস্তুত থাক, কারণ নিশ্চয় মৃত্যু তোমার সাক্ষাতে আসবে।

মৃত্যু (দেখে) ঘাবড়ে যেয়ো না; যখন তা তোমার (দেহ) উপত্যকায় নামবে।'

ইবনে মুলজিম কূফায় পৌঁছে গেল। আলী ﷺ সতেরো রমযান ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথে কোন এক সংকীর্ণ স্থানে সে তলোয়ার চালিয়ে তাঁর উপর হামলা ক'রে বলল, 'গ্রহণ কর (তরবারির আঘাত) ওহে আবূ তালেবের বেটা! নিজের জন্য কাফের হওয়ার কথা সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান চলবে না।'

তরবারি মাথায় লাগলে মুখ থেঁতলে পড়লেন আমীরুল মু'মিনীন। হাসান ﷺ সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুনীকে ধরতে আদেশ করলে, তাকে ধরা হল।

কি সুন্দর তার চেহারা! কপালে সিজদার কাল দাগ। অনেক অনেক নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত করে। অনেক অনেক আল্লাহর যিক্র করে। আল্লাহর বিধানকেই সর্ববিষয়ে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর জন্য জান দেয়, জান নেয়। আল্লাহর জন্যই আজ আমীরুল মু'মিনীনের জান নিতে চেয়েছে সে। যিনি তাকে কত সহযোগিতা করেছেন, অভাবে অনুগ্রহ করেছেন, কত অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এই নিমকহারামি আল্লাহর জন্য!

আলী ﷺ-কে বাসায় বহন ক'রে আনা হল। ইবনে মুলজিমকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তাকে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! আমি কি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? আমি কি তোমাকে এত এত মাল দিয়ে সাহায্য করিনি? আমি কি....?'

নিমকহারাম বলল, 'হ্যাঁ।'

আলী ﷺ বললেন, 'আমি ওর জীবন চাই, আর ও আমার হত্যা চায়! (এ যেন দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম!) আমি মারা গেলে ওকে হত্যা করো। আর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমিই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

গোঁড়া ধর্মান্ধ ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি ঐ তরবারিতে চল্লিশ দিন শান দিয়েছি এবং আল্লাহর কাছে দুআ করেছি যে, ওর দ্বারা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করব।'

আলী ﷺ বললেন, 'আমি মনে করি, তুমিই আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। ঐ তরবারি দ্বারা তোমারই গর্দান উড়ানো হবে।'

চরমপন্থীর আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে সরলপন্থী আমীরুল মু'মিনীন বাঁচতে পারলেন না। তিন দিন পর ২১শে রমযান সন ৪০ হিজরী তিনি দেহত্যাগ করলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু অআরযাহ।

ব্যক্তিপূজা

মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানে-গরিমায় এক মানুষকে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি অনেককে নিজের বন্ধুরূপে নির্বাচিত করেছেন। তাঁদেরকে মানুষের কাছেই প্রেরণ করেছেন, তাঁরই পরিচয় বলে দেওয়ার জন্য, তাঁরই নির্দেশ ও উদ্দেশ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই তাঁরা বড় মানুষ, বুযুর্গ মানুষ। তাঁরা মাননীয়, শ্রদ্ধেয়, বরণীয়। তা বলে তাঁরা পূজনীয় নন, উপাস্য নন।

কিন্তু মূর্খ মানুষ সে কথা ভুলে বসে, আল্লাহকে চিনতে গিয়ে তাঁদেরকেই পূজনীয় ভেবে বসে। তাঁদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে এবং যাঁরা মা'বূদের ইবাদতের পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদেরকেই ইবাদতের একটা অংশ দিয়ে বসে!

এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর ফিরিশ্তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে। মহান আল্লাহ সে কথার খণ্ডন ক'রে বলেন,

{أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا}

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফিরিশ্তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই বিরাট কথা বলে থাকো। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৪০ আয়াত)*

{وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} (١٩) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা দয়াময় আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকে নারী বলে স্থির করে, ওরা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। *(সূরা যুখরুফ ১৯ আয়াত)*

কিছু লোক জ্বিনকে তাঁর শরীক বানায়, তাঁর সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক স্থির করে! মহান আল্লাহ সে বিশ্বাস খণ্ডন ক'রে বলেছেন,

{وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} (١٠٠) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা জ্বিন্‌কে আল্লাহর অংশী স্থাপন করে, অথচ তিনিই ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওরা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে। তিনি মহিমান্বিত এবং ওরা যা বলে, তিনি তার উর্ধ্বে। *(সূরা আনআম ১০০ আয়াত)*

{وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ}

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহ এবং জ্বিন জাতির মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে। ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। *(সূরা স্বাফ্ফাত ১৫৮-১৫৯ আয়াত)*

বহু মানুষ কোন কোন নবীকে আল্লাহর বেটা বানিয়ে নিয়েছে! অথচ সূরা ইখলাসে তিনি বলেছেন, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেনও নি। তিনি জনক নন, জাতকও নন। খ্রিষ্টানরা মনে করে, যীশু আল্লাহর পুত্র! ইয়াহুদীরা মনে করে, উযাইর আল্লাহর বেটা! তিনি তাদের বিশ্বাস খণ্ডন ক'রে বলেছেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٣٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়)। তারা তো তাদের মতই কথা বলছে, যারা তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা উল্টা কোন্ দিকে যাচ্ছে! *(সূরা তাওবাহ ৩০ আয়াত)*

শুধু তাই নয়, খ্রিষ্টানদের অতিরঞ্জনের মাত্রা এত ছাড়িয়ে গেছে যে, তারা যীশুকেই স্বয়ং আল্লাহ বলে! মহান আল্লাহ তাদের কথার খণ্ডন ক'রে বলেন,

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ

رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

অর্থাৎ, তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।' অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' *(সূরা মাইদাহ ৭২ আয়াত)*

হ্যাঁ, খ্রিষ্টানরা উক্ত ধারণা পোষণ ক'রে কাফের হয়ে গেছে, আর কিছু মুসলমান অনুরূপ ধারণা পোষণ ক'রেও বহাল তবীয়তে 'মুসলমান'ই থেকে গেছে! যখন তারা তাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ধারণা রাখে,

যিনি আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ!
তিনি বিনা আয়নের আরব, অর্থাৎ রব!
তিনি বিনা মীমের আহমাদ, অর্থাৎ, আহাদ!

'আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

*****

'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৯ নং

*****

'মরহাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।
বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।
ছিলে মিশে আহাদে ,আসিলে আহমদ হ'য়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫১ নং

বরং নিজেদের গুরু সম্পর্কে ধারণা রাখে, গুরুই খোদা!

'ও মন পাগল রে! গুরু ভজো না,

গুরু বিনে মুক্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা!'

ভক্তিভাজন নিয়ে এমন অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়, যাতে তাঁর মান তাঁর ঊর্ধ্বের কারো মানে আঘাত না করে। মেয়ের প্রেমের অতিরঞ্জনে তাকে স্ত্রীর পজিশনে তুলতে পারেন না। তেমনি স্ত্রীর ভালবাসার অতিরঞ্জনে তাকে মায়ের পজিশনে তুলতে পারেন না।

অনুরূপ আব্দকে মা'বূদের আসনে তুলতে পারেন না। তুললে সর্বনাশ হয়। এই জন্য আমাদের নবী ﷺ বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

তিনি তাঁর মরণের পর তাঁর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ ক'রে গেছেন। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুকরণে তাঁর কবরকে দর্গা বানাতে নিষেধ ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহর অভিশাপ ইয়াহুদ ও নাসারার উপর, তারা তাদের আম্বিয়াদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী ১৩৩০,মুসলিম ৫২৯নং)*

"ওদের কোন সালেহ ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে ওরা তাঁর কবরের উপরে মসজিদ তৈরী করেছে। অতঃপর তাঁর মূর্তি (বা ছবি) বানিয়েছে। তারা আল্লাহর নিকট কিয়ামতে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪২৭, মুসলিম ৫২৮নং)*

"অতএব তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করো না। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

তিনি আরো তাকীদের জন্য আল্লাহর কাছেও দুআ ক'রে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজ্যপ্রতিমা বানিয়ে দিও না। আল্লাহর অভিশাপ সেই কওমের উপর যারা তাদের আম্বিয়াদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" *(আহমাদ ২/২৪৬)*

তাঁর মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। 'তিনি মরতে পারেন না, তিনি আবার ফিরে আসবেন' বলা হয়েছে। আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ তার খণ্ডন করেছেন।

তাঁর পরলোক গমনের খবর সাহাবাগণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমার ؓ বলেছিলেন, 'আল্লাহর রসূল অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং যে মনে করে যে, তিনি মারা গেছেন, তিনি তার হাত-পা কেটে ফেলবেন!'

আর তরবারি তুলে বলেছিলেন, 'যে বলবে যে, তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

কিন্তু আবূ বাক্র সিদ্দীক মহানবী ﷺ-এর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে চুম্বন দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাইরে এসে কুরআন মাজীদের আয়াত পাঠ দ্বারা তাঁর ইন্তিকালের কথা প্রমাণ ক'রে উমার ﷺ-কে প্রকৃতিস্থ করলেন।

আজও অনেকে বলে থাকেন, 'তিনি জীবিত আছেন। যারা বলে নবী মারা গেছেন, তারা বেআদব।' এখন আল্লাহ তাঁকে মৃত বলেছেন, আবূ বাক্র তাঁকে মৃত বলেছেন; কিন্তু অন্য কেউ বলতে গেলে বেআদবী হয় কিভাবে?

অনেকে বলেন, 'না, মৃত্যু নয়, বিসাল হয়েছে।' তার মানে নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। তার মানে ঐ আর কি,

'ছিলে মিশে আহাদে ,আসিলে আহমদ হ'য়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।'

তারপর তিনি আবার গিয়ে মিলিত হয়েছেন! অথচ এমন আক্বীদা অতিরঞ্জনে অবতারবাদী হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মতই।

অনেকে অতিরঞ্জন ক'রে বলে, তিনি নূরের তৈরী ছিলেন। তিনি মানুষ ছিলেন না, তাঁর দেহের ছায়া ছিল না। তাঁর পেশাব-পায়খানা-রক্ত পবিত্র ছিল। তিনি গায়বী খবর জানতেন। তাঁর জন্যই সারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। ইত্যাদি।

কিছু লোক আলী ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাঁকে 'ইলাহ' ধারণা ক'রে বসেছিল।

অনেকের মতে আলী মুহাম্মাদের মত দেখতে ছিলেন। জিব্রাঈল ভুল ক'রে মুহাম্মাদের কাছে অহী নিয়ে যান। নচেৎ আসল নবী হওয়ার কথা ছিল আলীর!

এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে, প্রথম খলীফা হওয়ার হকদার ও যোগ্য ছিলেন আলী। সাহাবারা ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে বাদ দিয়ে আবূ বাক্র এবং তারপর উমার ও উসমানকে খলীফা বানায়! আর তার জন্যই প্রথম তিন খলীফা তাদের নিকট কাফের। লা হাওলা অলা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সূফীবাদের অতিরঞ্জন রয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে বেশী মারাত্মক! তারা 'ফানা ফিল্লাহ' হয়। পরিশেষে তারা বলতে শুরু করে 'আনাল হক!' সর্বেশ্বরবাদ তাদেরই অবদান। কবি বলেছেন,

'কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে

কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো--- আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে।
ইচ্ছা অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।'

নূহ عليه السلام-এর সম্প্রদায় বুযুর্গ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা তাদের লোকেদেরকে বলেছিল,

{لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (٢٣) سورة نوح

অর্থাৎ, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াঊ'ক ও নাস্রকে। *(সূরা নূহ ২৩ আয়াত)*

এঁরা ছিলেন নূহ عليه السلام-এর জাতির সেই লোক যাঁদের তারা ইবাদত করত। এঁরা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আরবেও তাঁদের পূজা শুরু হয়েছিল। তাই وَدٌّ (অদ্দ) 'দূমাতুল জানদল'এর কাল্ব গোত্রের, سُوَاعٌ (সুআ) সমুদ্র উপকূলবর্তী গোত্র 'হুযায়েল'-এর, يَغُوْثَ (য়্যাগূস) ইয়ামানের সাবার সন্নিকটে 'জুরুফ' নামক স্থানের 'মুরাদ' এবং 'বানী গুত্বায়েফ' গোত্রের, يَعُوْقَ (য়্যাঊক্ব) হামদান গোত্রের এবং نَسْرٌ (নাস্র) হিমূয়্যার জাতির 'যুল কিলাআ' গোত্রের উপাস্য ছিলেন। *(ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)* এই পাঁচটিই হল নূহ عليه السلام-এর জাতির নেক লোকদের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাঁদের ভক্তদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এঁদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা তোমাদের স্মরণে সর্বদা থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এঁদের পূজা করত, যাঁদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। *(বুখারী ঃ সূরা নূহের তাফসীর পরিচ্ছেদ)*

পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম মূর্তিপূজা।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরাও আম্বিয়া ও সালেহীনদের কবরের উপর মসজিদ বানিয়েছে, সেখানে তারা আল্লাহর ইবাদত করেছে এবং ধীরে ধীরে কবরস্থ ব্যক্তির ইবাদত করেছে। আজও সেই সিলসিলাহ জারী আছে। মুসলিমরাও তাদের দেখাদেখি পিছিয়ে না থেকে অগ্রবর্তী হয়ে কবরপূজা ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠিত করে। কবর বাঁধানো হয়, তার উপর গম্বুজ তৈরী হয়, ফ্যান-লাইট লাগানো হয়, কবরের উপর মূল্যবান চাদর চড়ানো হয়, ফুল দেওয়া হয়, ধূপবাতি, মোমবাতি, মাটির ঘোড়া ইত্যাদি উপহার নিবেদন করা হয়। সেখানে নযর-নিয়ায-কুরবানী পেশ করা হয়, সিজদা-প্রণাম করা হয়, তওয়াফ করা হয়, কবরবাসীর কাছে সুখ-সমৃদ্ধি-সন্তান চাওয়া হয়! বাৎসরিক উরস ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শুধু তাই নয়, সে বুযুর্গের লাঠি পূজা হয়, নখ-চুল দাফন ক'রে পূজা হয়, তাঁর ঘোড়ার কবর পূজা হয়, সে মাজারের পায়রা মারা গেলে তা দাফন করার পর তার কবর পূজা হয় ইত্যাদি!

এক মাজারের ধারে-পাশে একটি স্থানে ছোট্ট কুয়া থেকে লোকে পানি নিয়ে বোতলে ভরছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, এটি যমযমের কুয়া!

বলি, যমযমের কুয়া তো মক্কায়। কিন্তু তা হল ইসমাঈলের, আর এ হল দাতা বাবার!

এক ময়দানে দেখি, সেখানে অনেক ছেলে-মেয়ে যত্নের সাথে এক শ্রেণীর ঘাসের ফুল তুলছে। ফুলটি ঠিক মোটা চুলের মত, শুকিয়ে যাওয়ার পর তাতে পানি পড়লে বা থুথু দেওয়া হলে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগে। ছেলেবেলায় জঙ্গলে পায়খানা করতে করতে ঐ ঘাসের ফুল নিয়ে থুথু দিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করতাম।

এক প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলি কি তুলছেন, কি করবেন?'

সে বড় খুশীর সাথে জবাব দিল, 'এগুলি দাতা সাহেবের দাড়ি বাবা! তাবীয হবে।'

হায় হায়! অতিরঞ্জনের কি আরো কিছু আছে?

জ্যান্ত পীর সাহেব এসেছেন। খোশ আমদেদের জন্য নারী-পুরুষের ভিঁড়। গাড়ি থেকে নামতেই নওশার মত কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এক বড় প্লেটের উপর রাখা হল। এক মহিলা এসে তাঁর পা ধুয়ে দিল। অতঃপর প্লেট থেকে নামানো হলে মাথার ঘন লম্বা চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিল! অতঃপর সেই পা-ধোওয়া পানি সকলের মাঝে একটু একটু ক'রে বিতরণ করা হল। আনন্দের সাথে নিজেদেরকে বড় সৌভাগ্যবান মনে ক'রে কোন মহা বর্কতের আশায় সকলে তা পান করল!

গ্রাম্য মহফিলে এসে ভক্ত নারী-পুরুষের হৈচৈ। করীম চাচা তার গাছের পেয়ারা নিয়ে এসেছে পীর সাহেবকে উপহার দেওয়ার জন্য, রহীম চাচা এক জিনিস, নযীর চাচা অন্য জিনিস। সকলেই পীর সাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম অথবা প্রণিপাত করে অথবা কদমবুসি করে আর ভেট পেশ করে।

রাজু ভাই শ্বশুরবাড়ির দেওয়া তার নতুন কাশ্মীরী শালটা নিয়ে এসেছে। তার শক সেটা পীর সাহেবের গদির উপরে বিছিয়ে দেবে, তিনি একবার তার উপরে বসলে তার ভাগ্য ফিরে যাবে।

আহ্লাদী বিয়ের আগে শীতল-পাটি চাটাই বুনেছে। সেও সেটা নিয়ে এসে বিছিয়ে দিয়ে পীর সাহেবকে একবার বসতে অনুরোধ করছে। যদি এই বর্কতে তার ঐ চাটায়ে ভাল বর এসে বসে!

এইভাবে ভাগ্য ফিরানোর কত প্রচেষ্টা, অতিরঞ্জনের কত ঘটা!

ভাত খসানোর সময় বড় প্লেটে অনেক পোলাও দেওয়া হচ্ছে। এক অজানা মহিলা বলছে, 'অল্প ক'রে দাও। পীর-কেবলা কি অত খেতে পারবেন?'

একজন মহিলা তার জবাবে বলছে, 'ওর কথা শুনিস না লো! ও জানে না। বেশী ক'রে দে, তবেই তো বর্কত (এঁটো) খাওয়া যাবে!'

হায়রে মানুষের ভক্তি! কিন্তু এ যে অতিভক্তি। আর এরূপ অতিভক্তি ধর্মচোরের লক্ষণ।

শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানীকে তারা পীরানে-পীর (বড় পীর) দস্তগীর বলে। তিনি নাকি মায়ের পেট থেকেই কুরআন হিফয ক'রে এসেছিলেন! মেয়েরা যদি খালি মাথায় তাঁর নাম নেয়, তাহলে নাকি চুল খসে পড়ে! তাঁর নাম নিতে হলে মাথায় কাপড় দিয়ে নিতে হয়! তিনি নাকি মুর্দাকে জিন্দা করতে পারতেন! তারা বলে,

'আব্দুল ক্বাদের জীলানী বড় বুযুর্গ পীর,
মুর্দাকে জিন্দা করেন হিকমতে জাহির।'

এ সব অতিরঞ্জন কি আল্লাহর নবী ﷺ-এর জন্যও ভাবা যেতে পারে?

ওয়াইস ক্বারনীর ব্যাপারেও অতিরঞ্জন করা হয়। উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ-এর দাঁত ভেঙ্গে গেলে, তিনিও তাঁর দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তাঁর কোন দাঁত ভেঙ্গেছে তা জানতে না পারার ফলে একটা একটা ক'রে নিজের বত্রিশটা দাঁতই পাথর দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন!

এই শ্রেণীর আরো অনেক খবর ভক্তির উচ্ছাসে ভক্তের বানানো গাঁজারে গল্প

আছে।

রাবেয়া বাসরীর জন্যেও অনেক সূফীপন্থী মানুষ বাড়াবাড়ি ক'রে থাকে। তাঁকে 'ইশ্কে ইলাহীর শহীদ' বলা হয়। তিনি ও তাঁর মত সূফীবাদীরা কেবল মহব্বতের সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন। তাঁরা মহান আল্লাহর জান্নাতের লোভ রাখেন না এবং জাহান্নামের ভয় করেন না। তাঁরা কেবল তাঁর পবিত্র 'ইশ্ক' চান! আর এই জন্যই রাবেয়াকে 'যিন্দীক' (জরথুস্ত্রপন্থী) বলা হয়েছে। *(মীযানুল ই'তিদাল ২/৬২)*

এই শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বাস করে, তাদের গুরু 'গায়বী' খবর জানে, মনের কথা বলতে পারে! তারা তাদের গুরুজনদের সাথে পথে সাক্ষাৎ হলে জুতা খুলে পা ছুঁয়ে সালাম করে! জুতা পায়ে সালাম করলে নাকি বেআদবী হয়। গুরুবাদীরা গুরুর ছবি নিয়ে বাড়ির দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। তা প্রত্যহ প্রণাম করে, তাতে ধূপ-বাতি ও ফুলের মালা দেয় ইত্যাদি। গুরুর ধ্যান করে, বিপদে গুরুকে স্মরণ করে। ফলে এদের নামাযের প্রয়োজন হয় না।

মহিলারা গুরুর সাথে বাপ-বেটীর মত সম্পর্ক কল্পনা ক'রে পর্দা তুলে দেয় এবং গুরুর সাথে নির্জনতা অবলম্বন ও তার দৈহিক খিদমত বৈধ মনে করে!

অতিরঞ্জনকারীরা কা'বা নিয়ে অতিরঞ্জন করে, গিলাফের সুতা ছিঁড়ে তাবীয বানায়, মীযাবের গড়ানো বৃষ্টির পানি পান করে ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক স্থান নিয়ে অতিরঞ্জন করে, মসজিদ নিয়ে অতিরঞ্জন করে, সেখানকার ধূলামাটি বর্কতময় মনে করে, মক্কা-মদীনা তথা আরো অনেক জায়গার মাটি অনেকে ওষুধরূপে খায়, অনেকে কবচ বানায়।

কোন অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। এরা কারামত, যাদু বা প্রাকৃতিক কারণে আশ্চর্যমূলক জিনিসের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। কচি বাঁশ থেকে পানি বের হলে তা যমযম বা কোন 'বাবা'র চোখের পানি মনে করে। কোন মাযারের পাশে অস্বাভাবিক ঝরনা ঝরলে, তা যমযম মনে করে এবং তা ভক্তির সাথে পাত্র পূর্ণ ক'রে বর্কতের জন্য ব্যবহার করে। খতনা হওয়ার মত লিঙ্গ নিয়ে কোন শিশুর জন্ম হলে, সে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি হবে বলে ধারণা করে।

এদের মনটাই অতিবাদী। মা-বাপ নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ অবজ্ঞা করে এবং তাদেরকে বৃদ্ধ খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দেয়। অন্য দিকে এক শ্রেণীর মানুষ অতিরঞ্জন ক'রে তাদের পূজা করে। তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ইত্যাদি।

এক শ্রেণীর মহিলা স্বামীর ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং তাকে ভেঁড়া বানিয়ে

থাকে। অপর দিকে অন্য এক শ্রেণীর মহিলা অতিরঞ্জনপূর্বক স্বামীর পূজা করে, তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এবং তার নাম মুখে আনতে পাপবোধ করে! শবেবরাতের রাতে চেরাগ জ্বেলে মৃত স্বামীর রূহ আগমনের প্রতীক্ষা করে!

অনেক জাহেল মহিলা পায়ে মেহেন্দি লাগায় না; বলে, হুযুর পাক দাড়িতে লাগিয়েছিলেন, তা পায়ে লাগানো যায় কিভাবে? কিন্তু এইভাবে তো অনেক জিনিসই তাহলে পায়ে লাগানো যাবে না। যেমন মহানবী ﷺ পানি মাথায় নিয়েছেন, পান করেছেন। তাহলে তা দিয়ে কি ওযূ-গোসল করা যাবে না?

অনেকে ইসলামের কেবল একটা দিক নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। কেউ আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে সূফীবাদে বাড়াবাড়ি করে এবং ইসলামকে মসজিদ ও খানকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। কেউ দ্বীনী তবলীগের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে তবলীগের নির্দিষ্ট পদ্ধতিকেই আসল 'জিহাদ' বানিয়ে ফেলে। কেউ ইসলামের রাজনীতির দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে নামায-রোযা ঠিকমত না করলেও রাজনীতি ও ভোটাভোটির ব্যাপারে মাতামাতি করে এবং 'ইলাহ'-এর অর্থকে 'বিধানদাতা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। কেউ ইসলামের জিহাদের দিকটা নিয়েই এত বাড়াবাড়ি করে যে, সন্ত্রাসী কর্ম-তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে। ভারসাম্য হারিয়ে মুসলিম যুবক এমন এমন কাজে জড়িয়ে পড়ে, যা ইসলামের সরল-সঠিক পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

কাফেরবাদ

কিছু মানুষ আছে, যারা কথায় কথায় মানুষকে গালাগালি করে, কথায় কথায় মানুষকে বাঁদর-গাধা বানিয়ে থাকে। কিন্তু আরো এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা কথায় কথায় পাপী মুসলিমকে 'কাফের' বানিয়ে থাকে।

এক মুসলিম অসৎ মালিক তার চাকরকে ঠিকমত খেতে দেয় না, ডিউটির বাইরে কাজ নেয়, কাজে কোন ত্রুটি হলে মারধর করে, ঠিকমত বেতন দেয় না। এ মালিককে তারা 'কাফের' বলে।

একজন চার মযহাবের কোন এক মযহাবের তকলীদ করে না। অনেকে তাদেরকে 'কাফের' বলে।

এক রাজা ইসলামী সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে না। তাকে অনেকে চোখ বন্ধ ক'রে 'কাফের' বলে।

একজন নেতা রাজনৈতিক সফরে নেত্রীদের সাথে মুসাফাহাহ করে, অনেকে তা দেখে ঐ নেতাকে 'কাফের' বলে।

বলে, অমুক আমীর ইউরোপে গিয়ে মদ খায়, মাগিবাজি করে, ও 'কাফের' নয় তো কি?

কোন মুসলিমকে কোন ইসলাম-বিরোধী কথা বলতে শুনে বা কাজ করতে দেখে তাকে 'কাফের' বলা কোন সাধারণ গালি বা সাধারণ সহজ ব্যাপার নয়। মুসলিমের কোন পাপ দেখে তাকে কুফরের প্রতি সম্বন্ধ করা বড় বিপজ্জনক। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বলে এ 'কাফের' এবং সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয়, তাহলে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলা তাকে হত্যা করার সমান।" *(বুখারী, মুসলিম)*

পক্ষান্তরে কোন মুসলিমকে নির্বিচারে দুনিয়াতে 'কাফের' বলা ও আখেরাতে 'জাহান্নামী' ভাবার ব্যাপারটাই বড় সংকটে ফেলেছে এক শ্রেণীর উগ্রবাদী যুবককে। আসলে তাদের প্রকৃতিই উগ্র। তাদের মতামতও উগ্রপন্থী, তারা রাজনীতিতে উগ্র, ধর্মে উগ্র, মসলা-মাসায়েল নিয়ে উগ্র, মসজিদ নিয়ে, মাদ্রাসা নিয়ে, সরকারী অনুদান নিয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে, ছাগল-গরু ও হাস-মুরগী নিয়ে উগ্র।

আদনা কথায় চাষী বলে পাচন লাগাও, পাছায় গামছা-ওয়ালা বলে গলায় গামছা দাও, বন্দুক-ওয়ালা বলে শুট্ ক'রে দাও! এর ফলে বচসা ও কথা কাটাকাটি হয়, তারপর পার্টাপার্টি হয়, অতঃপর লাঠালাঠি ও মাথা ফাটাফাটি হয়। বড় বড় ব্যাপারে বোম ফাটাফাটি হয়।

ফতোয়াবাজি হয়, জিহাদের ফতোয়া আসে, অস্ত্র কেনা হয়, ফানা ফিল্লাহ যুবকরা জান দিতে প্রস্তুত হয়। আত্মঘাতী হামলা ক'রে বেহেশ্ত যেতে চায়। জিহাদের অর্থ বুঝতে ভুল হয়, যেভাবেই হোক জান্নাত চায়, শহীদ হয়ে মরতে চায়, মরার সাথে সাথে হুরীদের স্বাগতম চায়। মনমতো ফতোয়াও পায়। কেউ তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলে তাঁর প্রতি নানা অপবাদ আরোপ করা হয়, অনেক সময় তাঁকে 'কাফের' বানিয়ে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

উগ্র কাফেরবাদীদের এই হামলা থেকে নিরপরাধ মানুষরাও রেহাই পায় না। মুসলিমদের জাতীয় সম্পত্তিও রক্ষা পায় না। পরিশেষে ক্ষতি হয় সাধারণ মুসলমানদেরই। মাদ্রাসা-মসজিদের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। টুপীওয়ালা-দাড়িওয়ালার প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিপ্লববাদ, ভীতিমূলক রাজদ্রোহবাদ বা Terrorism ইসলামে বৈধ নয় এবং কোন সৎ উদ্দেশ্যেও তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

রাজনীতিক ক্ষমতালাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি ত্রাসজনক কর্ম ইসলামে বৈধ নয়।

রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক কর্ম অবলম্বন করা ইসলামে বৈধ নয়।

একাকী অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি ইসলামে নেই।

নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে খুন করে অথবা তাদের ঘর-বাড়ি বা বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করে ত্রাস সৃষ্টি ক'রে কোন ফায়দা লোটার নীতি ইসলামে বৈধ হতে পারে না।

কোন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অথবা সরকারের কাছে কোন দাবী মঞ্জুর করাবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরকারী অথবা বেসরকারী সম্পদ ধ্বংস ক'রে, ভাঙচুর ক'রে, নিরাপদ আম জনতার মাঝে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করা, তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করা ইসলামে বৈধ হতে পারে না।

সবলকে পেরে না উঠে কাপুরুষের মত দুর্বলকে পিষ্ট ক'রে সবলকে সন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে অভীষ্ট লাভের নীতি ইসলামে বৈধ নয়।

বিবেকও বলে না, অপরাধীদের পরিবর্তে নিরপরাধ মানুষদেরকে খুন করতে। কোন জাতির কিছু লোক অথবা গ্রামের কিছু লোক রক্ত-পিপাসু শত্রু হলেও ঐ জাতির বা ঐ গ্রামের সকল লোককে রক্ত-পিপাসু ধারণা করে ব্যাপকভাবে তাদের উপর ধ্বংসলীলা চালানোর অনুমতি ইসলাম দিতে পারে না।

উক্ত শ্রেণীর কর্মকান্ড ইসলামে ধ্বংসাত্মক কর্ম বা ফাসাদ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর উক্ত কর্মকান্ড জিহাদ নয়। যেহেতু ইসলামে জিহাদের যে নীতি-নৈতিকতা আছে উক্ত কর্মগুলি তার পরিপন্থী।

তাছাড়া বিদিত যে, সন্ত্রাসের কোন ধর্ম নেই। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বরং নাস্তিকদের মাঝেও সন্ত্রাস বিদ্যমান আছে। যারা বলে, 'ধনবানরা বলবান আর বলবানরাই ভগবান', তারা ধনলাভের জন্য সন্ত্রাস করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সন্ত্রাসের এই রীতি সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রায় ১৭৯৩-১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে;

যা Reign of Terror নামে প্রসিদ্ধ।

মুসলিমদের মাঝে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ

প্রশ্ন হল, এ নীতি যদি ইসলামী না হয়, তাহলে মুসলিমদের অনেকেই সন্ত্রাসী হল কেন? বিশেষ ক'রে যারা মুসলিম সন্ত্রাসী তারা ধার্মিকতার দিক থেকে বহু উন্নত। তাছাড়া তারা তা ধর্ম মনে করেই ক'রে থাকে।

উত্তরে বলা যায় যে, এর একাধিক কারণ রয়েছে; তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

(১) সন্ত্রাসকে জিহাদ বলে বোধভ্রম।

অনেক অল্প শিক্ষিত মুসলিম, যাঁদের কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ততটা জ্ঞান নেই এবং যাঁরা মুফতী পর্যায়ের আলেম নন, তাঁরা জিহাদের নির্দেশকে মানতে গিয়ে কুরআন-হাদীসের বাণীকে অপপ্রয়োগ ক'রে ফেলেছেন। তাঁদের বুঝার ভুলে জিহাদ ও সন্ত্রাসের মাঝে কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি। দ্বীনের স্পৃহা তাঁদের মনে এতই প্রবল হয়ে প্রকট হয়েছে যে, তাঁরা অতিরঞ্জন তথা গোঁড়ামির শিকার হয়ে মুসলিমকেও অনায়াসে 'কাফের' মনে করেছেন। ফলে আবেগময় উদীয়মান সাদা মনের কিছু যুবক শহীদ হয়ে বেহেশ্তে হুরী লাভের আশায় তাঁদের ফতোয়া মতে সন্ত্রাসকেই বর্তমান যুগের আধুনিক জিহাদ মনে ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছে।

পক্ষান্তরে ভুল বুঝেছে অন্য এক শ্রেণীর মানুষ, যারা তাদের কর্মকান্ড দেখে মনে করে যে, ইসলামে সন্ত্রাস আছে অথবা জিহাদই হল সন্ত্রাসের অপর নাম। আর এই ভুল বুঝের ফলে তারা ইসলাম তথা ইসলামের নবীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ইসলামী শিক্ষাকে বন্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে অথবা তাতে সংশোধন (?) আনার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের মুখে ও কলমে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরাও কিন্তু এক শ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ; যদিও তারা উচ্চ শিক্ষিত।

(২) কিছু মুসলিম কাফের বা তাদের মতে কাফেরের হাতে নিকৃষ্টভাবে অত্যাচারিত হয়, কারো বা বাড়ি-ঘর ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়, ধ্বংস করা হয় মসজিদ-মাদ্রাসা, চোখের সামনে পিতামাতা অথবা সন্তানকে হত্যা করা হয় এবং অকথ্য নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয় প্রেমময়ী স্ত্রী, স্নেহময়ী মা, মেয়ে অথবা বোন। হাতছাড়া হয় বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি। এ সব দেখে তাদের নিরাশ মনে যে কঠোরতা এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল বাসনা সৃষ্টি হয়, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সন্ত্রাসের মাধ্যমে। মোকাবেলা ও সম্মুখ যুদ্ধে তাদের বৃহত্তর শত্রুকে পেরে উঠবে না জেনেই উক্ত পথকে তারা বদলা নেওয়ার উত্তম

পথরূপে বেছে নেয়। তাদের মন তখন বলে,

'ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।'

মানুষকে যখন তার মৌলিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, মানুষ তখনই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ঐ বিপ্লবে নিজের রক্ত দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। যেহেতু তারা নিরাশ মনে জানে যে, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার অর্জন ক'রে নিতে হয়। মান-মর্যাদা ও অধিকারহীন জীবনের কোন মূল্য নেই। অতএব পরাধীন জীবন রেখে লাভ কি? আর তখনই সে মরিয়া হয়ে সন্ত্রাসের কুপথকে সুপথ মনে ক'রে বেছে নেয়।

উদাহরণ খারাপ হলেও, অনেকের বুঝের নিকটবর্তী। একজন অত্যাচারী যখন অত্যাচার করে এবং শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে ধরা খেয়েও পৃষ্ঠপোষক, ঘুস ইত্যাদির ফলে আইনের হাত থেকে আরামসে বেঁচে যায়। তখন হিরো আইনকে হাতে নিয়ে সংগ্রাম করে, ফাইট করে এবং অত্যাচারীদেরকে স্বহস্তে শায়েস্তা করে। অধিকাংশ ফিল্মে এই শ্রেণীর ঘটনা দেখানো হয়ে থাকে। আর তারই অনুকরণে কিছু উদীয়মান তরুণ উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুরূপ হিরোগিরি শুরু ক'রে দেয়। যে কাজ সরকারের মাধ্যমে হওয়া জরুরী ছিল, সে কাজ সরকার করে না বলে যুবক নিজের অথবা কোন সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদন ক'রে থাকে।

আর এ জন্যই সন্ত্রাসবাদী দমন করার পূর্বে কর্তৃপক্ষের উচিত হল, সন্ত্রাসের কারণ নির্ণয় এবং তার উৎসমুখ আবিষ্কার ক'রে তা সমূলে উৎখাত করা। নচেৎ তুফানের উৎসমুখ বন্ধ না ক'রে দূরে থেকে বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টাতুষের আগুনকে খড় দিয়ে চেপে রাখার মতই।

(৩) অন্যায়-অত্যাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, শির্ক, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, গান-বাজনা, মদ্যপান ইত্যাদি অপরাধ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, চোখের সামনে তা দেখে একজন দ্বীনদার মানুষের ঘৃণা হওয়ারই কথা। কিন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়া এই যে, সরকারীভাবে সেই সব শির্ক, ব্যভিচার ও অশ্লীলতার প্রতিষ্ঠানকে রীতিমত অনুমোদন দেওয়া হয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাতে সরকার পক্ষের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকে। যে কাজ বন্ধ করা দরকার ছিল সরকারের, সে কাজ ঐ সকল আবেগময় যুবক নিজের হাতে নিয়ে ঐ কুকাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসকে জিহাদ মনে ক'রে ব্যবহার করে। আর এতে রয়েছে উভয় পক্ষের বাড়াবাড়ি।

বাকী অধার্মিক সমাজবিরোধীদের কথা স্বতন্ত্র। তারা কোন স্বার্থের পূজারী অথবা

খেয়াল-খুশীর অনুসারী অথবা তারা ভাড়াটিয়া খুনী।

৪। কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান, সঠিক বুঝ ও সঠিক প্রয়োগের অভাব। 'জিহাদ' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা।

৫। বিদআত ও অমূলক আকীদার আধিক্য এবং তার ফলে ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব, দলাদলি ও খেয়ালখুশীর অনুসরণ, পরস্পর গালাগালি তথা কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি।

আবেগময় যুবক যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গালি দিতে শোনে, কোন সাহাবীকে 'কাফের' বলতে শোনে, আয়েশাকে ব্যভিচারিণী বলতে শোনে, হকপন্থী আহলে সুন্নাহকে ওয়াহাবী 'নজদী কুত্তে' বলতে শোনে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কি স্বাভাবিক নয়?

৬। সলফে সালেহীনের মতাদর্শ না জানা অথবা দৃষ্টিচ্যুত করা ও তা হতে বিমুখ হওয়া।

৭। হক্কানী ও রব্বানী উলামার সাহচর্য হতে দূরে থাকা এবং আবেগময় ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী নিম আলেম বক্তার অনুসরণ করা।

৮। কিছু দ্বীনী জ্ঞান লাভ ক'রে অহংকারের শিকার হওয়া এবং প্রকৃত আলেমদেরকে ছোট অথবা স্বার্থপর জ্ঞান করা, নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বিশ্বের বড় বড় আলেমদের মতকে তুচ্ছজ্ঞান করা।

৯। ফুটন্ত রক্তের উঠন্ত যৌবনের যুবকদের আবেগ-প্রবণতার নাকে ইল্‌ম ও হিকমতের লাগাম না থাকা। গাড়ি যত দামীই হোক, যতই তার স্পীড থাক, ব্রেক না থাকলে বিপদ অনিবার্য। অনুরূপ আবেগ-মথিত দ্বীনী স্পৃহার সাথে ইল্‌ম ও হিকমতের লাগাম না থাকলে ভ্রান্তি স্বাভাবিক।

১০। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বর্ণ-বৈষম্যের শিকার হয়ে নিরাশাবাদিতা। যাদের উন্নতির কথা বিস্মৃত হয়, বঞ্চনা যাদের ভাগ্য হয় এবং বেকারত্ব যাদের অভিশাপ হয়, তারা আত্মহত্যা অথবা সন্ত্রাস ছাড়া আর পথ পায় না!

১১। মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আল্লাহর বিধানের অবমাননা, আল্লাহর বিধানের উপর মানব-রচিত বিধানকে অগ্রাধিকার প্রদান, ব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতার নামে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে কটাক্ষ, দ্বীনদারদের বিরুদ্ধে নানা উত্তেজনামূলক মন্তব্য, নারী-স্বাধীনতার নামে যৌন-স্বাধীনতার প্রসার, ইসলামী ব্যক্তি ও সংগঠন দমন এবং ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠনের লালন (শিষ্টের দলন, দুষ্টের পালন) ইত্যাদি।

১২। নেতৃবর্গ কর্তৃক মুসলিম-বিদ্বেষী বিজাতির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং অনেক ক্ষেত্রে পদলেহী গোলামের গোলামি প্রদর্শন।

১৩। বিজাতি কর্তৃক মুসলিম দেশের উপর বিদেশী আগ্রাসন এবং কাফের শাসক কর্তৃক মুসলিম দেশ শাসন। মুসলিমদের জমি-জায়গার জবরদখল এবং পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদাহানি করণ।

১৪। ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি কারণ এই যে, বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে ধর্ম ও ধার্মিক নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়, উল্টে তাতে নোংরামি ও অশ্লীলতা প্রচার করা হয়, শয়তানের চেলা-চামুণ্ডাদেরকে বড় ক'রে দেখানো হয় ও মর্যাদা দান করা হয়। পক্ষান্তরে সৎলোকদের গলায় অপমান ও লাঞ্ছনার মালা উপহার দেওয়া হয়। এতে কি ধার্মিকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে তাদের সুপ্ত উত্তেজনাকে জাগিয়ে তোলা হয় না? তাদের হাতে প্রচার মাধ্যম না থাকার কারণে ওদের প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করতে পেরে ইটের জবাব পাটকেল দ্বারা দেওয়ার পথ খোঁজে। আর তার জন্য খুব সহজ পথ হল সন্ত্রাসের পথ।

১৫। ধৈর্য-সহ্যের অভাব। অত্যাচারে ও অপমানে ধৈর্যধারণ ক'রে হিকমতের সাথে শরয়ী জিহাদ ও সংগ্রামের পথ অনুসন্ধান করলে সন্ত্রাসের গ্রাস হতে হয় না।

১৬। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন। মতভেদের সময় উগ্রবাদী মনোভাব ও কট্টরবাদী সমালোচনা। অবশ্য এমনটি ঘটে দ্বীন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলেই। ফাটা ঢেকির শব্দ বেশী হয়। আর সেই শব্দ তর্ক-বিতর্ক থেকে দ্বন্দ-দাঙ্গা এবং তার পরেই জিহাদের দুলদুলে সওয়ার করিয়ে সন্ত্রাসবাদে পৌঁছে দেয়। অবশ্য এই অতিরঞ্জনকারীদের ধর্মবিষয়ক প্রজ্ঞা কম হলেও ইবাদতবিষয়ক প্রচেষ্টা অনেক বেশী। আর এরা সাধারণতঃ আবেগপ্রবণ উদীয়মান যুবক হয়; যাদের উদ্যম বেশী; কিন্তু অভিজ্ঞতা কম। যেমন বিদ্রোহী খাওয়ারেজরা অনুরূপ ছিল।

এই শ্রেণীর যুবকরা জানে না যে, শরীয়তে মঙ্গল আনয়ন অপেক্ষা অমঙ্গল দূরীকরণ অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত। এরা জানে না বা মানে না যে, একই কাজের পশ্চাতে যদি লাভ-ক্ষতি দুই থাকে। তাহলে লাভ করার চেষ্টা না করে ক্ষতি যাতে না হয়, তারই চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য লাভের অংশ বিশাল এবং ক্ষতির অংশ কিঞ্চিৎ হলে সে কথা ভিন্ন।

এরা জানে না বা মানে না যে, মন্দকে মন্দ দিয়ে দূর করা যায় না। পেশাব দিয়ে পায়খানা ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন হয় না। আগুনকে আগুন বা পেট্রোল দিয়ে না

নিভিয়ে পানি দ্বারা নিভাতে হয়।

যেমন কোন মন্দ দূর করতে গিয়ে যেন অধিকতর মন্দ সৃষ্টি না হয়ে যায়। নচেৎ সে মন্দ দূর করা বাঞ্ছনীয় নয়। আঙ্গুলের ব্যথা দূর করতে গিয়ে যদি গোটা শরীরে ব্যথা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা মৃত্যুর ভয় থাকে, তাহলে সে ব্যথা দূর করা নিশ্চয়ই ভাল নয়।

এরা জানে, ঈমানী জোশ চাই, দ্বীনী জযবা চাই, ইসলামী স্পৃহা চাই, স্পিরিট চাই, স্পীড চাই, সংগ্রামের তুফান চাই, আন্দোলনের ঝড় চাই; কিন্তু এ কথা জানে না বা মানে না যে, এসব কিছুতে লাগাম চাই, ব্রেক চাই, সংযম চাই, বাঁধ চাই, বন্ধন চাই। নচেৎ মহাসর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মুসলিম-সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুসলিম-সন্ত্রাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে দ্বীনী অতিরঞ্জনের পচা সারকুঁড়ে। যাতে অংশগ্রহণকারী ছিল জাহেল আবেদ, প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী, মুনাফিক ও জরথুস্ত্রপন্থী-ঘেঁসা লোকেরা। সেই সাথে যোগ দিয়েছিল কিছু আবেগপ্রবণ, প্রবল উদ্যমময়, অতিরিক্ত উৎসাহী ও কঠোর উত্তাপশীল মনের কিছু নওজোয়ান; যাদের দ্বীনী জ্ঞান ছিল অপরিপক্ক, ভক্তি ছিল উপচীয়মান, পার্থিব অভিজ্ঞতা ছিল স্বল্প, বিবেক-বুদ্ধি ছিল অপরিণত। যারা প্রয়োজনে আহলে ইলমদের নিকট থেকে সঠিক পথনির্দেশ গ্রহণ করেনি; বরং অনেক সময় নিজেদেরকেই বেশী বড় আহলে ইল্ম মনে করেছে!

এমনই একটি গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল খাওয়ারেজ দল। যে দল সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে খোদ সাহাবাগণ যুদ্ধ করেছেন এবং মহানবী ﷺ-এর পূর্ব-ঘোষণা অনুসারে সেই যুদ্ধে সওয়াবের আশা রেখেছেন।

মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "অচিরেই শেষ যামানায় একটি নির্বোধ যুব-দল হবে, যারা লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা কিয়ামতে পুরস্কৃত হবে।"

(বুখারী ৩৬১১, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৩৫ নং)

যুগে যুগে উক্ত শ্রেণীর দল উদ্ভূত হতে থেকেছে। বর্তমান যুগে মিসরের 'জামাআতুত তাকফীর অল-হিজরাহ' ও জামাআতুত তাওয়াক্কুফ অত্-তাবাইয়ুন' উক্ত বিদ্রোহী দলেরই উত্তরসুরি। আর তাদেরই ছিটেফোঁটা প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে সারা বিশ্বে।

বলাই বাহুল্য যে, সঠিক ইসলামের সাথে তাদের উক্ত কর্মকাণ্ডের নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

উগ্রপন্থীদের বৈশিষ্ট্য

উগ্রপন্থীদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার সমষ্টি দ্বারা তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন ঃ-

১। তারা হবে উদীয়মান যুবক। মহানবী ﷺ বলেছেন, "অচিরেই শেষ যামানায় একটি নির্বোধ যুব-দল হবে, যারা লোক সমাজে সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। কিন্তু ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা কিয়ামতে পুরস্কৃত হবে।" *(বুখারী ৩৬১১, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৩৫ নং)*

একদা ক্বাবীসাহ এক ফতোয়া অমান্য করলে উমার ﷺ বলেছিলেন, 'হে ক্বাবীসাহ বিন জাবের! আমি দেখছি, তুমি নব-যুবক, প্রশস্ত হৃদয় ও বাগ্মী। যুবকের মাঝে নয়টি সদ্গুণ এবং একটি বদগুণ থাকে। আর একটি বদগুণ তার সমস্ত সদ্গুণকে নষ্ট ক'রে দেয়। সুতরাং তুমি নবীনদের পদস্খলন থেকে সাবধান থেকো।' *(তাফসীর কুরতুবী ৭/৪৯)*

২। তারা নিজেদের জ্ঞান ও আচরণে আত্মগর্বের শিকার হবে। আলেম ও অভিজ্ঞ লোকেদের মতামতকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।

উমার ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য যা বেশী ভয় করি, তা হল নিজের মত নিয়ে আত্মগর্ব করা। সুতরাং যে (গর্বের সাথে) বলবে, সে মু'মিন, সে আসলে কাফের। যে বলবে, সে আলেম, সে আসলে জাহেল। আর যে বলবে, সে জান্নাতী, সে আসলে জাহান্নামী।' *(তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৫১৩)*

৩। তারা হক্কানী উলামাদের সমালোচনা করবে, তাঁদের নিয়ত ও মনের (গায়বী)

কথার বিচার করবে, তাঁদের প্রতি অমূলক অপবাদ আরোপ করবে, ভাড়াটিয়া ও স্বার্থপর ভাববে, তাঁদেরকে রাজতোষ, তোষামুদে ও দুনিয়াদার ভাববে; বরং অনেক সময় ভ্রষ্ট ও কাফের ভাববে, বেআদবির সাথে প্রকাশ্যে তাঁদের প্রতিবাদ করবে!

৪। শরয়ী সমস্যা সমাধানে নিজেদের জ্ঞানকে কুরআন-হাদীসের উক্তির উপর প্রাধান্য দেবে! আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু মাল বন্টন করছিলেন। এমন সময় ইবনু যিল খুয়াইসিরাহ তামীমী এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায়ভাবে ভাগ করুন।' নবী ﷺ বললেন, "সর্বনাশ হোক তোমার! আমি ন্যায্য ভাগ না করলে, আর কে করবে?" উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।' তিনি বললেন, "ছেড়ে দাও ওকে। ওর আরো সঙ্গী আছে। যাদের নামাযের কাছে, তোমাদের কারো নামাযকে তুচ্ছ জানবে, যাদের রোযার কাছে, তোমাদের কারো রোযাকে নগণ্য জানবে! তারা দ্বীন থেকে সেই রকম বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।....." *(বুখারী, মুসলিম)*

৫। তাদের ইবাদত হবে অনেক। তারা ফরয-সুন্নত ছাড়া নফল পড়বে অনেক। ফরয-সুন্নত ছাড়া নফল রোযা রাখবে বেশী। সরল পথের পথিকের নামায-রোযা তাদের নামায-রোযার তুলনায় অনেক কম হবে; যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

তারা বাহ্যিক সুন্নতেরও বড় পাবন্দ হবে। যেমন কোন কোন বর্ণনায় 'ঘন দাড়ি' ও 'মাথা নেড়া'র কথা রয়েছে। অথচ হজ্জ-উমরাহ ছাড়া মাথা নেড়া রাখা সুন্নত নয়। যেমন সুন্নত নয় গোঁফ চেঁছে ফেলা।

অধিক ইবাদতের লক্ষ্যে তারা বিদআতও করবে। যেমন আম্র বিন সালামাহ বলেন, ফজরের নামাযের পূর্বে আমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ-এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম। যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মূসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, 'এখনো কি আবূ আব্দুর রহমান (ইবনে মাসঊদ) বের হন নি?' আমরা বল্লাম, 'না।' অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে বের হয়ে এলেন, তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দন্ডায়মান হলাম। আবূ মূসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম, যা অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি।' তিনি বললেন, 'কি সেটা? ' (আবু মূসা) বললেন, 'যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-

এক গোল বৈঠকে বসে নামাযের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়। তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।' তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, 'আপনি ওদেরকে কি বললেন?' আবু মূসা বললেন, 'আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি।' তিনি বললেন, 'আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর যামানত কেন নিলেন না?'

আম্র বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌঁছে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?' ওরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর, তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।' তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মাদ! কি সত্বর তোমাদের ধ্বংসের পথ এল! তোমাদের নবীর সাহাবাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্ত্র এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্রসমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অথবা তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার উদ্‌ঘাটনকারী?!' ওরা বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালরই ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, 'কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায় না! অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না।" আর আল্লাহর কসম! জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে।'

অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আম্র বিন সালামাহ বলেন, 'নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠকসমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সাথে দেখেছিলাম। যারা আমাদের (আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২০০৫নং)*

৬। ভাল বা বৈধ কাজেও তারা নেতার নেতৃত্ব অমান্য করবে। এরা হবে রাজদ্রোহী। যেমন শুরুর খাওয়ারিজরা খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্ব অমান্য করেছিল। তারা রাজনীতিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান মানতে অস্বীকার করবে; কিন্তু সেই বিধান নিজের জীবনে স্পষ্টতঃ লংঘন করবে। যেমন আলী ﷺ-এর সাথে খাওয়ারিজদের আচরণে জানা যায়।

৭। মুসলিম রাষ্ট্র যখন উন্নয়ন ও ঋদ্ধি-বৃদ্ধির পথে থাকবে, তখনই তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। হয়তো বা নেতৃত্ব ও গদির লোভে রাজদ্রোহিতা ক'রে বসবে। যেমন তৃতীয় খলীফা উসমান ﷺ-এর যুগে যখন ইসলামী খিলাফত চরম উন্নত হতে শুরু করল, তখনই তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটল। খলীফার সুখ-সমৃদ্ধি তাদের পছন্দ হল না।

৮। তাদের বাহ্যিক একটি নিদর্শন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একদল হবে যাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে এবং কর্ম হবে অসুন্দর। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা (সেইরূপ দ্বীনে) ফিরে আসবে না, যেরূপ তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। শুভ পরিণাম তার জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং যাকে তারা হত্যা করবে। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে আহবান করবে, অথচ তারা (সঠিকভাবে) তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে হবে বাকী উম্মত অপেক্ষা আল্লাহর নিকটবর্তী। তাদের চিহ্ন হবে মাথা নেড়া।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৬৮নং)*

অর্থাৎ, অতিরিক্ত পরহেযগারী দেখাতে গিয়ে মাথাই নেড়া রাখবে।

সন্ত্রাস রুখার উপায়

সন্ত্রাস একটি নৈতিক ব্যাধি। মুসলিম সমাজ থেকে তা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ-

১। অত্যাচার বন্ধ হলে, সন্ত্রাস বন্ধ হবে। ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা হলে, সন্ত্রাস বিদায় নেবে। অধিকারীর অধিকার ফিরে পেলে, সন্ত্রাস বন্ধ হবে। আগ্রাসন বন্ধ হলে, সন্ত্রাস দমন হবে। যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই লড়ে, তারা যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে তাদের স্বাধীনতা ও স্বদেশ ফিরিয়ে দিলেই শান্তি ফিরে আসবে।

২। দ্বীনী জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। বিশেষ ক'রে যুবকদের মাঝে সঠিক ইসলাম তুলে ধরতে হবে। 'জিহাদ' ও 'সন্ত্রাস'-এর মাঝে পার্থক্য প্রচার করতে হবে। বুঝাতে হবে যে, ইসলামে 'জিহাদ' আছে; কিন্তু সন্ত্রাস নেই। একজন সন্ত্রাসী মুজাহিদ হতে পারে না।

৩। হক্কানী ও রব্বানী উলামাদের সাথে যুবকদের সরাসরি সম্পর্ক সহজ করতে হবে। তাদের বক্তৃতা ও বই তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

৪। কোন উগ্রপন্থীকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনভাবেই তার সাহায্য ও সমর্থন করা যাবে না।

৫। সন্ত্রাসীদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে। তাদের সন্দেহ নিরসন করতে হবে। তাদের দাবী-দাওয়া বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। অবশ্য আলোচনা আঘাতের মাধ্যমে নয়, বরং হিকমতের সাথে অভিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে করতে হবে। যেমন ইবনে আব্বাস ﷺ খাওয়ারিজদের সাথে করেছিলেন।

৬। তাদের বিরুদ্ধে কাদা ছুঁড়ে বা তাদেরকে গালাগালি ক'রে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করা যাবে না। একটি দামাল শিশু যদি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতে চায়, তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য যে স্নেহময় পদ্ধতি জ্ঞানীরা ব্যবহার করেন, তেমনি একজন মুসলিম সন্ত্রাসীকে বাঁচানোর জন্য উলামা ও নেতৃবর্গের সেই পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যাতে সাপও মরে এবং ছিপও না ভাঙ্গে।

অবশ্য আলী ﷺ উক্ত বিদ্রোহী খাওয়ারিজদের সাথে চার প্রকার আচরণ করেছিলেন ঃ-

(ক) হক পথে ফিরে আনার জন্য তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(খ) যারা যুদ্ধাগ্রহী ছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

(গ) তাদের ব্যাপারে সর্বদা সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

(ঘ) তাদের বিদআত প্রকট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

মুসলিম রাষ্ট্রে এইভাবেই সন্ত্রাস দমন হওয়া উচিত। উলামাগণের উচিত, তাদেরকে 'জিহাদ'-এর সঠিক অর্থ বুঝাবেন, তাদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেবেন। হিদায়াত তো জোর ক'রে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। শরয়ী জিহাদ যেহেতু তোমার

ক্ষমতা নেই, সেহেতু ধৈর্য ধর।

কতদিন ধৈর্য ধরব?

যতদিন না জিহাদের শর্তাবলী পূরণ করতে পেরেছ। নচেৎ 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' (ধর্মে জোরজবরদস্তি নেই)---এ কথা মেনে নাও।

ধৈর্যহারা কেন হবে? জোশে-আবেগে লাগামহীন কেন হবে? আল্লাহর নবী ﷺ কি ধৈর্য ধারণ করেননি? তিনি তো বদ্দুআ ক'রে সব ধ্বংস ক'রে দিতে পারতেন। তায়েফ থেকে ফিরে এসে তিনি কি ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন? তিনি কি পাহাড় চাপিয়ে মানুষ ধ্বংস করতে সম্মত হয়েছিলেন? আল্লাহ কি তাঁর নবীকে বলেননি,

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} (৯৯) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে বিশ্বের সকল লোকই বিশ্বাস করত; তাহলে তুমি কি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? *(সূরা ইউনুস ৯৯ আয়াত)*

{وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ}

অর্থাৎ, যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সোপান অন্বেষণ ক'রে তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আনআম ৩৫ আয়াত)*

উঠতি যৌবনের তাজা যুবকদের জ্ঞানী আলেমগণকে বুঝানো উচিত যে, রক্তাপ্লুত মুসলিম-বিশ্বের অবস্থা দেখে আবেগে উত্তেজিত হয়ে নিজে নিজে জিহাদ ঘোষণা করা বৈধ নয়। সংকট মুহূর্তে জোশ দ্বারা নয়, বরং হুঁশ দ্বারা কাজ নিলে তবেই সাফল্য লাভ হয়।

আল্লাহ মুসলিম যুব-সমাজকে সুমতি দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.